সাত সমুদ্র
অমিত চক্রবর্তী
অজানা নিখিলে

সাত সমুদ্র

পত্র ভারতী

বি ষ য় ভি ত্তি ক এ ন্ সা ই ক্লো পি ডি য়া সি রি জ

প্রথম গ্রন্থ ঃ

সাত সমুদ্র

ডঃ অমিত চক্রবর্তী

প ত্র ভা র তী □ PARTA BHARATI

৩/১ ক লে জ রো ॥ ক লি কা তা ৭০০ ০০৯ □ 3/1 College Row, Calcutta - 700 009

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন ১৯৮৬

SAT SAMUDRA
by
Dr. Amit Chakraborty
— সুতপা চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

অলংকরণ ও অংগসজ্জায়
অলয় ঘোষাল ● দেবদত্ত
নন্দী এবং ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য
বাইশ টাকা

উৎসর্গ

মা (শ্রীমতী রেখা ত্রিবেদী)কে

পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত॥

নিবেদন

পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হয়েছিলো সমুদ্রে—এখন থেকে তিনশো বিশ কোটি বছর আগে। তারপর সময়ের তালে তালে সেই প্রথম-প্রাণের রূপবদল ঘটেছে ক্রমাগতঃ; এককোষী অ্যামিবা থেকে এসেছে লক্ষ কোটি প্রজাতির জীব, এসেছে মানুষ। প্রাণীরা তাদের নোনতা রক্তের জন্য ঋণী সাগরের নোনাজলের কাছে; শিরায় শিরায় সেই ঋণের অনুভূতিই কি মানুষকে বারে বারে টেনে নিয়ে যায় সমুদ্রের কাছে ?

গত তিন-চার দশকে সমুদ্রকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা অনেকটাই বেড়েছে, মূলতঃ বেঁচে থাকার তাগিদে। যত দিন যাচ্ছে, মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে—প্রকৃতির ভাঁড়ারে টান পড়ছে ততই। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর যাবতীয় চাষযোগ্য জমি চষে ফেলেও যে মানুষের ক্ষিধে মেটানো যাবে না, তা একরকম চোখ বুঁজে বলা যায়। পাশাপাশি, মানুষের জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় খনিজ আর জ্বালানী তেল—মাটির নিচে তার সংস্থানটুকুও তো ফুরিয়ে এল বলে! ডাঙ্গার মানুষকে তাই অনেক বেশী করে হাত বাড়াতে হচ্ছে সমুদ্রের জৈব আর খনিজ সম্পদের দিকে। ওসানোগ্রাফী বা সমুদ্রবিদ্যা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট শাখা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সমুদ্র-বিষয়ক গবেষণায় ভারতীয়রাও আজ পিছিয়ে নেই। গোয়ার ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ওসানোগ্রাফী তার সাক্ষী।

সমুদ্র নিয়ে এই বই হয়তো আদৌ লেখা হতো না যদি না র‍্যাচেল কার্সন-এর লেখা 'দ্য-সী' হাতে পড়তো। পঞ্চাশের দশকে লেখা বই, আজকের নিরীখে তথ্যগুলিও অসম্পূর্ণ, তবু লেখিকার রচনাশৈলী বইটিকে আজও আকর্ষণীয় করে রেখেছে। সমুদ্র বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্যের জন্য আর যেসব বই ঘাঁটতে হয়েছে তার মধ্যে আলেকজান্ডার কোন্দ্রাতোভ-এর 'দ্য রিড্‌ল্‌স্ অথ থ্রি ওসান্‌স্', এন. গোর্‌স্কি-র 'দ্য সী—ফ্রেন্ডস্ এ্যান্ড ফো', লিওনার্ড এঞ্জেল-এর 'দ্য সী', আলেক ফ্রেশার-ব্রুনার-এর 'ডেঞ্জার ইন দি সী', এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে প্রকাশিত 'দ্য ওসান—ম্যানকাইন্ড্‌স্ লাস্ট ফ্রন্টিয়ার' এবং ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ক কথিকাগুলির সংকলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'অজানা নিখিলে' সিরিজে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে সরস বই প্রকাশের পরিকল্পনা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। ওঁর লেখা 'ভয়ংকরের জীবন-কথা' বইটি না পড়লে এবং ব্যক্তিগতভাবে ওঁর কাছ থেকে উৎসাহ না পেলে 'সাত সমুদ্র' পাঠকদের কাছে আদৌ কোনওদিন পেঁছতো কিনা সন্দেহ। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় প্রকাশক শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং 'পত্র ভারতী'র সংগে যুক্ত আরো অনেককে। বইটি প্রকাশে এঁরা সকলে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তার জন্য এঁদের কাছে আমি ঋণী।

১লা বৈশাখ, ১৩৯২

অমিত চক্রবর্তী

সাত সমুদ্র : বিষয়সূচী

এক

ব্রহ্মা ও শতরূপার ছেলে প্রিয়ব্রত। অনেককাল আগে প্রিয়ব্রত তখন বিশ্বকর্মার মেয়ে বর্হিষ্মতীকে বিয়ে করে সুখে দিন কাটাচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো—সূর্য তো গোটা পৃথিবীটাকে একইসঙ্গে আলোয় ভরিয়ে দেন না। ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হলো না প্রিয়ব্রতর। তিনি ঠিক করলেন, সূর্যের সাথে দেখা করে ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া করতে হবে; গোটা পৃথিবীকে একইসঙ্গে আলো দেওয়ার জন্য তাঁকে রাজী করাতে হবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সূর্যদেব অস্ত যান পশ্চিম দিগন্তের পারে, সুতরাং জ্যোতির্ময় রথে চেপে ঐদিকেই ঘোড়া ছোটালেন প্রিয়ব্রত। কিন্তু সাতদিন সাতরাত ঘোড়া ছুটিয়ে পৃথিবীটাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে আসার পরও সূর্যের নাগাল মিললো না। তা না মিলুক, সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় রথের চাকার ঘষটানিতে পৃথিবীর বুকে তৈরী হলো সাত-সাতটা প্রকাণ্ড গহ্বর। পরে, ঐ সাতটা গহ্বর—নুন, আখের রস, সুরা, ঘি, দই, দুধ আর জলে ভরে গিয়ে সাত-সাগরের রূপ নিলো।

ভারতীয় পুরাণের এ কাহিনী শোনার পর কেউ যদি দই-সাগর কিংবা দুধ-সাগরের খোঁজে বেরোয় তবে সে নির্ঘাত বেজায় ভুল করবে। সাগরে যেমন ঘি-দই-দুধ মেলে না, তেমনি সাগরের সংখ্যাও সাত-এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী। পৃথিবীতে মহাসাগরই আছে পাঁচটা: প্রশান্ত, অতলান্তিক, ভারত, সুমেরু আর কুমেরু মহাসাগর।

কুমেরু বা দক্ষিণমেরু-সাগরকে আবার অনেকে প্রশান্ত, অতলান্তিক আর ভারত মহাসাগরের অংশ বলেই ধরে থাকেন। সেদিক থেকে দেখলে অবশ্য মহাসাগরের সংখ্যা চার। এছাড়াও আছে বেশ কিছু ছোট-মাঝারি সাগর-উপসাগর—যেমন, ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ চীনসাগর, মেক্সিকো উপসাগর কিংবা বঙ্গোপসাগর। পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭০.৮ ভাগ অংশই রয়েছে ঐসব সাগর-মহাসাগরের দখলে।

সমুদ্রের জন্মরহস্যের জাল ছিঁড়তে গিয়ে দেখা গেলো, আমাদের এই পৃথিবীর বয়স কমবেশি ৪৫০ কোটি বছর এবং সমুদ্রের বয়সও পৃথিবীর বয়সেরই কাছাকাছি। মাটির তলায় পাথরের গায়ে যেসব তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ রয়েছে, তাদের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ থেকেই পৃথিবী আর সমুদ্রের বয়সটা আঁচ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

সেই সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তির টানে সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলো বিরাট এক গ্যাসপিণ্ড; মহাকর্ষের টানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে তা। সময়ের সাথে সাথে সেই গ্যাসপিণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে তরলে রূপান্তরিত হলো। তরলের যেটা ঘন অংশ, ওজনে যেটা ভারী—তা চলে গেলো কেন্দ্রের দিকে; তার উপর রইলো

সেই স্তরটা যার ভার অপেক্ষাকৃত কম, আর তরলের সবচেয়ে হাল্কা অংশটা ভেসে উঠলো সবার উপরে।

কোটি কোটি বছর পার হয়ে এলেও আজো পৃথিবীর কেন্দ্রের চারপাশে রয়েছে তরল লোহা—দুশো কোটি বছর আগের মতোই এখনও ভয়ঙ্কর গরম, ফুটছে টগবগ করে। এর উপরের স্তরেই রয়েছে ব্যাসাল্ট-এর পুরু আবরণ—যার অবস্থাটা তরল আর কঠিনের মাঝামাঝি। সবার উপরে রয়েছে পাথুরে ব্যাসাল্ট আর গ্রানাইটের স্তর—যা পৃথিবীর গোটা ব্যাসের তুলনায় খুব সামান্যই পুরু।

শখানেক বছর আগে, ১৮৭৮ সালে, বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের ছেলে জর্জ ডারউইন শোনালেন মহাসাগর সৃষ্টির ব্যাপারে নতুন কথা। তিনি বললেন, চারশো থেকে সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর বাইরের আবরণ যখন পুরোপুরি শক্ত হয় নি, সেই সময় সূর্যের টানে পৃথিবীর তরল বুক থেকে খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গেছিলো। সেই হারানো অংশই চাঁদ-এর রূপ নিয়ে আজও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

চাঁদ পৃথিবীর বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার পর ভূত্বকের মধ্যে যে প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হয় সেখানেই পরে জন্ম নিলো প্রশান্ত মহাসাগর। শুধু প্রশান্ত মহাসাগরই নয়, সেই সময় গোটা পৃথিবীর বুকে যে তোলপাড় জেগেছিলো তারই ফলে পৃথিবীর উপরটা হয়ে গেলো বিষম এবড়ো খেবড়ো; ক্রমশঃ উঁচু জায়গাগুলো রূপান্তরিত হলো মহাদেশগুলোর ডাঙ্গা-জমিতে আর নীচু জায়গাগুলোয় জল জমে জন্ম হলো অতলান্তিক আর ভারত মহাসাগরের।

পনেরো-বিশ বছর আগেও জর্জ ডারউইনের কথাগুলিকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরের জলের তলায় নিরেট মেঝেটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তার প্রায় সবটাই ভারী ব্যাসাল্ট পাথরের তৈরী; অথচ অন্যান্য মহাসাগরের বেলায় ব্যাসাল্ট-এর উপরে রয়েছে হাল্কা গ্রানাইট পাথরের স্তর। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের হাল্কা গ্রানাইটের গোটা অংশটাই যে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদ-এ পরিণত হয়েছে, এমনটাই তো স্বাভাবিক।

জর্জ ডারউইন এবং পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের ধারণাটা যে একদম ভুল, চাঁদ যে মোটেই পৃথিবীর বুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া অংশ নয়, তার প্রমাণ মিলেছে একেবারে হালে।

চাঁদের মাটি পরীক্ষার পর এমন সব মৌল ধাতুর সন্ধান মিলেছে যা এযাবৎ পৃথিবীতে পাওয়াই যায় নি। তাছাড়া, পৃথিবীর গা থেকে চাঁদ ছিটকে বেরিয়ে যাবার ফলেই যদি প্রশান্ত মহাসাগরের খাত সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তার বয়সটা অন্যান্য সাগর-মহাসাগরের তুলনায় ঢের বেশী হওয়া উচিৎ; অথচ মহাসাগরগুলির মেঝের পাথর পরীক্ষা করে দেখা গেছে—অতলান্তিকের অধিকাংশ জায়গা প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব অংশের তুলনায় অনেক বেশী পুরনো।

একজন ব্রিটিশ ভূ-বিজ্ঞানী বললেন ঃ সৃষ্টির সেই গোড়ায় পৃথিবী যখন ছিলো একটা তরল পিণ্ড—নিজের অক্ষের চার-পাশে তখন প্রচণ্ডবেগে ঘুরতো সে। ক্রমে সেই বেগ যখন কমে এলো, পৃথিবীর সবচেয়ে উপরে হাল্কা তরলের স্তরটা আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে শক্ত সরের মতো ঢেকে ফেললো গোটা পৃথিবীটাকে!

ভূ-ত্বক ঠাণ্ডা হলেও পৃথিবীর ভেতরটা তখনও টগবগ করে ফুটছে। সেখানকার প্রচণ্ড তাপ পৃথিবীর উপরকার পুরু আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার সময় কোনও কোনও অঞ্চলকে ঠেলে উপরে তুললো; সেগুলোই হলো আজকের উঁচু সব মহাদেশ। পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চল ঠেলে ওঠার সময় তার তলায় জমে থাকা তরল ব্যাসল্ট বেরিয়ে এসে নীচু অঞ্চলের মেঝেগুলিকে ভরাট করলো। এজন্যেই সমুদ্রগর্ভ ব্যাসাল্ট-পাথর দিয়ে তৈরী।

হাল আমলের কিছু বিজ্ঞানী আবার বললেনঃ সৃষ্টির গোড়ায় পৃথিবী যখন একটা নিষ্প্রাণ গ্রহ—যখনও সে বাতাসের

চাদর মুড়ি দেয় নি, সেসময় মহাজাগতিক বস্তুপিন্ড এসে অহরহ আছড়ে পড়তো পৃথিবীর বুকে। ফলে গোটা গ্রহটার গায়ে তৈরী হলো ছোটবড়ো সব গর্ত। ক্রমে এইসব ছোটবড় গর্তগুলোই পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে তৈরি করলো সাগর-মহাসাগরের খাত।

পৃথিবীর বুকে মহাসাগরের গর্ত যেমন করেই তৈরী হোক না কেন, শুরুতে তা ছিলো শুকনো খটখটে। এক ফোঁটাও জল ছিলো না তাতে। তারপর পৃথিবী যত ঠান্ডা হতে লাগলো, পৃথিবীর উপরটা যখন তরল অবস্থা থেকে শক্ত ব্যাসাল্ট পাথরে রূপ বদলাতে থাকলো—ততই পৃথিবীর ভেতরকার জলীয় অংশটা বাষ্পপুঞ্জের আকারে ঢেকে ফেললো গোটা পৃথিবীটাকে। প্রথম প্রথম অবশ্য সেই বাষ্প জলকণার রূপ ধরে পৃথিবীতে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর ভয়ঙ্কর গরমে বাষ্প হয়ে আবার উঠে গেছে উপরে। এই ঘটনাটাই ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, বারে বারে।

তারপর একদিন, পৃথিবীর উপরটা যখন অনেকটাই ঠান্ডা হলো, পৃথিবীর গায়ে সেদিন যে জলকণা এসে পড়লো তা আর বাষ্প হয়ে উড়ে গেলো না। ব্যস! সেদিন থেকে বৃষ্টি শুরু হলো পৃথিবীতে, অবিরাম, অঝোর বৃষ্টি। চললো দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। সাগর-মহাসাগরের শুকনো খাতগুলো ভরে গেল টলটলে জলে। মহাসাগরগুলোর উঁচু ডাঙা ধুয়ে জল এসে পড়তে থাকলো সাগরে।

সেই সময়ের পৃথিবীতে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটে চলেছিলো। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মের প্রভাবে বাতাসের জলকণা থেকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে মহাকাশে পাড়ি জমাতে শুরু করে, আর অক্সিজেন এসে মিশতে থাকে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে।

এমনিভাবে কেটে গেলো কত লক্ষ লক্ষ বছর। তারপর প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে একদিন—কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার সমৃদ্ধ মহাসাগরগুলির নোনতা জলে জন্ম নিলো প্রথম প্রাণ। সেদিন পৃথিবী নিজেই বোধহয় শিউরে উঠেছিলো বিস্ময়ে, আনন্দে। নির্জীব, নিষ্প্রাণ সে বুঝি সফল হলো এতদিনে। সেই থেকে আজও বয়ে চলেছে সেই প্রাণেরই অবিরাম স্রোতধারা।

দুই

অ্যাদিকালের সাগর
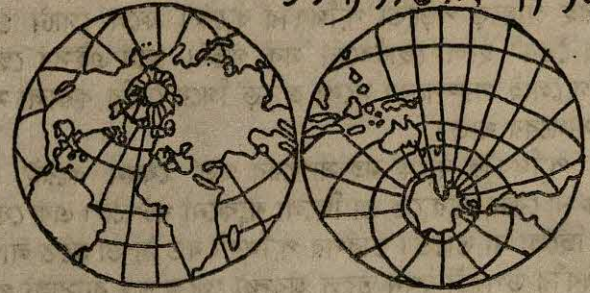
আমাদের পৃথিবীকে জলময় গ্রহ বললে কি ভুল বলা হবে ?

অনেক অনেক উঁচু থেকে দেখলে কিন্তু সত্যিই মনে হয়, মহাদেশগুলো বুঝি জলের উপর ভেসে থাকা কতকগুলো দ্বীপ; মহাসাগরের জল অহরহ সেই দ্বীপগুলির গায়ে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র আর মহাদেশের সীমারেখা টেনেছে যে সমুদ্র সৈকত, সেখানেই চলেছে সাগরের ঢেউয়ের সাথে পাথুরে ডাঙগার অবিশ্রান্ত যুদ্ধ— কোটি কোটি বছর ধরে !

মহাদেশগুলো যে আদৌ অনড় অচল নয়, তারা যে দিব্যি ঘোরাফেরা করে, এই অদ্ভুত কথাটা প্রথম বললেন, জার্মান বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার, ১৯১৪ সালে। উনিই বললেন, সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রায় ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ছিলো মাত্র একটিই মহাদেশ, যার নাম 'প্যান্জিয়া'। সেই 'প্যান্জিয়া' মহাদেশকে ঘিরে ছিলো এক বিশাল মহাসাগর—'প্যান্থালাসা'।

কালক্রমে প্রাকৃতিক কারণে 'প্যান্জিয়া' মহাদেশটি দুটো টুকরোয় ভেঙ্গে গিয়ে সরে গেলো একে অন্যের কাছ থেকে। তাদের একটা টুকরোর নাম 'গণ্ডোয়ানা'—মধ্যভারতের 'গণ্ড' অঞ্চলের নামানুসারে। এতে ছিলো দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ মেরু। অন্যটার নাম 'লরেশিয়া' —যাতে ছিলো ইয়োরোপ, এশিয়া, গ্রীণল্যাণ্ড আর উত্তর আমেরিকা। এই দুই মহাদেশের মাঝখানে রইলো 'টেথিস সাগর'। পরে 'গণ্ডোয়ানা' আর 'লরেশিয়া' আরও কতকগুলো টুকরোয় ভেঙ্গে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, আর তাদের মাঝে আদি মহাসাগর 'প্যান্থালাসা'র রূপ বদল হয়ে জন্ম নিলো আজকের মহাসাগরগুলো। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা ভেঙ্গে সরে গেলো 'গণ্ডোয়ানা' থেকে এবং এদের মাঝে জন্ম নিলো দক্ষিণ অতলান্তিক মহাসাগর।

এই ভাঙগা জোড়া কিন্তু থেমে থাকলো না। মহাদেশের ভাঙন শুরু হয়েছিলো, ডেভোনিয়ান যুগে; প্রায় ছ'কোটি বছর আগে 'ইয়োসিন' যুগে মহাদেশের বিভিন্ন টুকরোগুলো পরস্পরের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যায়। অষ্ট্রেলিয়া সরে যেতে থাকে দক্ষিণমেরু থেকে, আর ভারত এগিয়ে যেতে থাকে এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে। শেষতক ভারতের ধাক্কায় 'টেথিস সাগর' লোপ পেয়ে সেখানে জন্ম নিলো হিমালয় পর্বতমালা।

মহাদেশগুলো কিভাবে চলে ফিরে বেড়ায় সে ব্যাপারে সবচেয়ে জোরালো মতটায় পৃথিবীর পিঠকে ধরা হয়েছে কতকগুলো প্লেট বা পাত-এর সমন্বয় হিসেবে। সমুদ্র আর মহাদেশগুলো

রয়েছে এইসব পাতদের উপর। এরা স্থির না হওয়ার দরুন মহাদেশ আর সমুদ্রের চেহারা বারে বারে পাল্টেছে এবং এখনও নাকি পাল্টে চলেছে!

শুনলেই বুক ধড়ফড় করে ওঠে, প্রায় সব সাগর-মহাসাগরের জল নাকি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এমনিতেই ঝড়-ঝঞ্ঝা-সাইক্লোনের সময় সমুদ্রে জল বাড়ে, উঁচু ঢেউগুলো উপকূল অঞ্চলে প্লাবন আনে; সমুদ্র শান্ত হলে ডাঙগা থেকে জল সরে যায় আবার। তবু গত ৩০ বছরে প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগর, মেক্সিকো উপসাগর, বেরিং এবং চীনসাগরের জলরেখা অন্ততঃ গড়ে ফুটখানেক বা ৩০ সে.মি. উঠে এসেছে, এবং খুবই সামান্যহারে হলেও মহাদেশগুলি যে ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে তার বিস্তর প্রমাণ মিলেছে।

এই ভাবে বাড়তে বাড়তে অতলান্তিক মহাসাগরের জলরেখা এখনকার তুলনায়, আর বেশি না, মাত্র ৩০ মিটারও যদি উঠে আসে তাহলে উত্তর আমেরিকার প্রায় সব শহরগঞ্জ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে; মহাদেশের বদলে জলের উপর ভেসে থাকবে টুকরো কতকগুলি দ্বীপ।

অবশ্য ব্যাপারটা নতুন কিছুই নয়। সাগর-মহাসাগরের জন্মের পর মহাদেশগুলোর জলমগ্ন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বহুবার। পৃথিবীর মানচিত্রও তাই বদলেছে বারে বারে।

সবচেয়ে বড় প্লাবনের ঘটনা ঘটেছিলো সম্ভবতঃ দশ কোটি বছর আগে—'ক্রেটাসিয়াস' যুগে। উত্তর আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল চলে গেছিলো উত্তর-মেরুসাগর আর অতলান্তিকের জলের তলায়। জল বেড়েছিলো অন্যান্য সাগরেও; জলের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো শুধু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পাহাড়ী অঞ্চলগুলো!

সমুদ্রের জল আফ্রিকা মহাদেশের একটা বড় অংশ দখল করে বালি-পাথরের বিস্তীর্ণ স্তর ঢেলেছিলো তার বুকে। আজকের আদিগন্ত বালির সমুদ্র সাহারা মরুভূমির জন্ম ঐভাবেই।

ইয়োরোপের সুইডেনে এক নতুন সমুদ্রের জন্ম হয়েছিলো এবং তার বিস্তৃতি ছিলো এখনকার হিমালয় পর্যন্ত। ভারতের বেশ খানিকটা অংশ ছাড়াও সাইবেরিয়া, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার উপর দিয়ে বয়ে যেতো ভারত মহাসাগরের জল।

সেই ক্রেটাসিয়াস যুগেরও বহু আগে, ৪০ কোটি বছর আগের সেই 'ডেভোনিয়ান' কিংবা 'সিলুরিয়ান' যুগের পৃথিবীতে যদি আমরা ফিরে যাই, দেখবো একই ঘটনা। সত্যি বললে, গোটা পৃথিবীতে আজ বোধহয় একটুকরো জমিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যাকে সাগর অন্ততঃ একবারও বুকের মধ্যে টেনে নেয়নি। তবে 'ডেভোনিয়ান' যুগের পর সাগর-মহাসাগরে সঞ্চিত জলের পরিমাণে তেমন একটা হেরফের হয়নি।

উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে চুনাপাথরের স্তরই বলে দেয়—ঐসব জায়গা এককালে সাগরের আওতায় ছিলো। হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ-কোটি সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা জমে জমেই যে আজকের চুনাপাথরের চেহারা নিয়েছে তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। হিমালয়ের ৬ হাজার মিটার উপরেও সামুদ্রিক চুনাপাথর মনে করিয়ে দেয় আদ্যিকালের এক বিশাল সমুদ্রের কথা—যার তলায় ডুব দিয়েছিলো দক্ষিণ ইয়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এক বিরাট ভূখন্ড। খুব সম্ভবতঃ সেটা পাঁচ কোটি বছর আগের কোন এক সময়।

'নিউমুলাইটিস' নামে এক বিশেষ জাতের প্রোটোজোয়া সেইসময় ভেসে বেড়াতো সাগর-জলে। মারা যাবার পর এগুলিরই খোলা জমে জমে তৈরী হয়েছে এক বিশেষ জাতের চুনাপাথর—যা দিয়ে প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিড আর স্ফিংস বানিয়েছিলো তাদের আমলে।

ইয়োরোপের আয়ার্ল্যান্ড থেকে শুরু করে ডেনমার্ক, জার্মানী, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত মাটির তলায় যে খড়ি-মাটির স্তর দেখতে পাওয়া যায় তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'ক্রেটাসিয়াস' যুগের ক্ষুদে ক্ষুদে সব জলজ প্রাণীদের কথা।

'ফোরামিনিফেরা'—নামে সেই সব জলজ প্রাণীর খোলাগুলো জমাট বেঁধে ঐ অঞ্চলে তৈরী হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর এক বিপুল ভাণ্ডার ।

যত দূর জানা গেছে, সৃষ্টির সময় থেকে এযাবৎ পৃথিবীর সাগর-মহাসাগররা মূলতঃ তিনটি পর্যায় পেরিয়ে এসেছে। মহাসাগরের জন্মের পর প্রথম পর্যায়ে গর্ত আর খাদে বোঝাই পৃথিবীর নীচু অংশগুলোই শুধু জলে ভর্তি ছিলো; দ্বিতীয় পর্যায়ে মহাদেশগুলোর একটা বড় অংশকে সমুদ্র দখল করে নেয়। সবশেষ পর্যায়ে মহাদেশগুলো আবার মাথাচাড়া দিয়ে
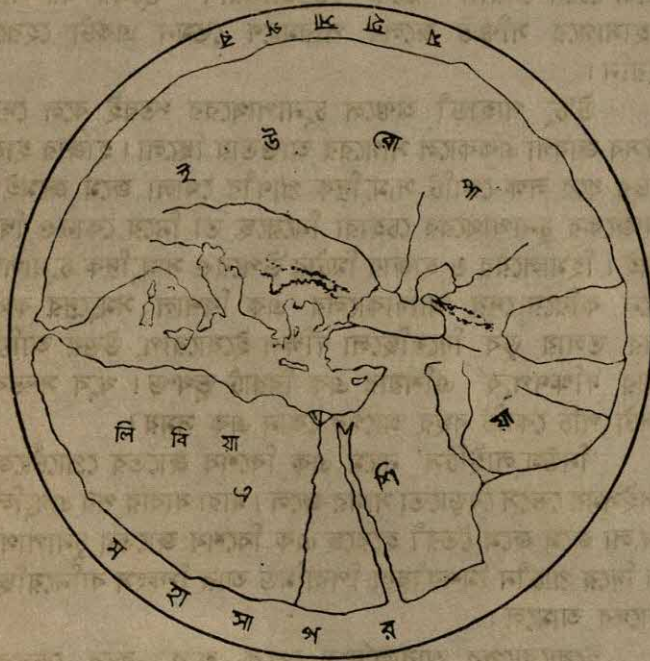
খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীকদের ধারণা ছিলো, গোটা পৃথিবীটাই মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। ইয়োরোপ আর এশিয়া ছাড়া অন্য কোন মহাদেশের কথা জানা ছিলো না ওদের।

উঠে এসেছে জলের উপর আর সমুদ্র সরে গেছে তার পুরনো খাতে।

একাধিক কারণেই ওঠানামা করে থাকে সমুদ্রের জল। পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রতিনিয়তঃ যে সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটে চলেছে তারই প্রভাবে মহাদেশের ডাঙগাজমি এবং সমুদ্রের তলদেশও ওঠানামা করে থাকে, যদিও সমুদ্রের তলদেশের তুলনায় মহাদেশের ওঠানামার পরিমাণটা কিছু বেশি। ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা যতই কমে—সাগরের জলও ততই ডাঙগাজমি দখল করতে থাকে; ভূ-পৃষ্ঠ যেই আবার উঁচু হতে শুরু করে তখন সমুদ্রের জলও ফিরে যায় নিজের পুরনো অবস্থায়।

তাছাড়া, মহাদেশগুলো ধুয়ে জল এসে সমুদ্রে পড়ার ফলে সমুদ্রের মেঝেয় পলি জমা পড়ে; এতেও জলরেখা উঁচুতে ওঠে। অথবা সমুদ্রের তলায় কোনও আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার ফলে তার উৎসমুখ থেকে বেরিয়ে আসা লাভাস্রোত যখন সমুদ্রের খাত ভরাট করে কোনও দ্বীপের জন্ম দেয়, তখন যে বিপুল জলরাশি সরে যেতে বাধ্য হয় তাও অনেক সময় মহাদেশের নীচু অংশগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই ধরনেরই বড়োসড়ো ঘটনা ঘটেছে 'ক্রেটাসিয়াস' যুগে, যখন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জন্ম হয়েছিলো। অন্যদিকে মহাদেশগুলোর বুকে শুরু হয়েছিলো বিরাট প্লাবন, সে জলতরঙ্গ রোখার সাধ্য কার! ভূ-বিজ্ঞানের পরিভাষায় সেটা 'প্লিসটোসিন' যুগ।

আমরা এখন পৃথিবীতে যে ধরনের আবহাওয়ার সাথে পরিচিত, তার জন্ম হয়েছে আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদের গ্রহের উপর দিয়ে চার-চারটি তুষার যুগ পার হয়ে গেছে।

বছর পঞ্চাশেক আগে অতলান্তিক মহাসাগরের নীচে পাথর এবং জীবাশ্ম পরীক্ষা করার পর যে দুজন সমুদ্র-

বিজ্ঞানী তুষার যুগের আসা-যাওয়ার কথা প্রথম বলেছিলেন তাঁদের নাম—মরিস এউইঙ্‌ এবং উইলিয়াম ডন্‌।

এউইঙ্‌ আর ডন্‌-এর মতকে সমর্থন করতে গিয়ে ঐ তিরিশের দশকেই পৃথিবীর এক সেরা ভূ-পদার্থবিদ মিলুটিন মিলাকোভিচ হাজির করলেন এক নতুন তত্ত্ব। বললেন ঃ আমাদের পৃথিবী যে তার নিজস্ব অক্ষরেখার চারপাশে প্রতিদিন লাট্টুর মতো পাক খেয়ে চলেছে—সেই অক্ষরেখাও কিন্তু একেবারে স্থির হয়ে নেই।

খুব সামান্য হারে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থানের যেটুকু পরিবর্তন হয় তার প্রভাব পড়ে পৃথিবীর আবহাওয়ায়। পৃথিবীর অক্ষরেখার অবস্থান এবং সেই রেখা বরাবর পৃথিবীর পাক খাওয়ার গতিবেগ—এই দুই-এর পারস্পরিক পরিবর্তনে পৃথিবীর উষ্ণতায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হেরফের হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, পৃথিবীর গড় উষ্ণতা যদি এখনকার তুলনায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়, তাহলে মেরু অঞ্চলের তুষারের প্রচন্ড স্রোতে উত্তর আমেরিকা, ইয়োরোপ তো বটেই, আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চলও বরফের তলায় চাপা পড়বে। মেরু অঞ্চলে বেশী পরিমাণে বরফ জমার ফলে সাগরের জলও নেমে যাবে বেশ খানিকটা।

পৃথিবী এখন চার নম্বর তুষার-যুগের শেষ পর্যায়ে এসে পেঁছেছে। প্রায় দেড়-দুলক্ষ বছর আগে এই তুষার যুগের চরম পর্যায়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যে পুরু বরফ পড়ে তাতে, সেইসময় মহাসাগরের জল যদি হাজার মিটারও নেমে গিয়ে থাকে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

একবার কল্পনা করা যাক না সেই দিনগুলোর কথা। এশিয়া আর ইয়োরোপের উত্তরে সেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে যেসব মানুষ বাস করতো তারা লক্ষ্য করলো, প্রতিবছর বরফ এসে একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছে তাদের পাহাড়-গুহা, জমি-জায়গা। শিকার করার বনজঙ্গল তুষারে ঢেকে যাচ্ছে দেখে তারা পাড়ি জমালো আমেরিকার দিকে। এশিয়া আর আমেরিকার মাঝখানে বেরিং-প্রণালীর জল সেই সময় সরে গিয়ে দুই মহাদেশের মাঝখানে তৈরী হলো সেতু। সম্ভবতঃ তারই উপর দিয়ে হেঁটে নতুন মহাদেশে পেঁছালো আমাদের পূর্বসূরীরা।

দক্ষিণ গোলার্ধে ভারত মহাসাগরের তীরের উষ্ণ অঞ্চলে যেসব মানুষ বাস করতো তারা অবশ্য তুষার-যুগ আসার খবর পায় নি। তারা শুধু খবর পেয়েছিলো, সমুদ্রের জল নেমে গিয়ে সাগরের মাঝে নতুন নতুন ভূখন্ড বেরিয়ে পড়ছে। ভারত এবং সিংহলের মাঝখানে সমুদ্রের বেড়াজাল সরে যেতেই ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীরা চটপট পাড়ি জমালো নতুন দ্বীপে। সম্ভবতঃ এই সময়েই এশিয়া থেকে কিছু মানুষ অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে—সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা নতুন নতুন দ্বীপের উপর দিয়ে।

আমরা এখন তুষার যুগের শেষে এসে পেঁছেছি। সুমেরু, গ্রীণল্যান্ড আর নাতিশীতোষ্ণ ক্রান্তীয় দেশগুলির উঁচু জায়গায় যে পরিমাণ বরফ জমে আছে, তা ধরে রেখেছে প্রায় ২ কোটি কিউবিক কিলোমিটার জল। একটু একটু করে সেই বরফ এখন গলছে!

যেদিন সমস্ত বরফ গলে যাবে আর সেই জল যখন সমুদ্রে এসে মিশবে—সমুদ্র সেদিন উঠে আসবে ৫৬ মিটার উপরে। পৃথিবীর শুকনো ডাঙ্গার ৮ ভাগের ১ ভাগ জায়গা সেদিন চলে যাবে জলের তলায়, ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় নগর-বন্দর! তারপর?

তারপর আবার হয়তো আসবে নতুন তুষার-যুগ; সমুদ্র আবার আস্তে আস্তে আজকের চেহারা নেবে।

এখনই অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। ঐ সময় আসতে এখনো হাজার হাজার বছর বাকী। তখন আজকের আমরা কেই বা থাকবো কোথায়। সেসময়ের মানুষ নিশ্চয়ই বহু বহুগুণ এগিয়ে যাবে বিজ্ঞানে, নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে মহাবিশ্বের অন্য কোন গ্রহে বাসা বাধার।

তিন

যতদূর জানা গেছে, শেষ তুষারযুগ এসেছিলো প্রায় দেড়-দু'লক্ষ বছর আগে; উত্তর গোলার্ধে বরফ জমার ফলে সমুদ্রের জল নেমে গেছিলো গড়পড়তা প্রায় দেড়শো মিটার। কুয়াশাচ্ছন্ন সেই সুদূর অতীতের আধাসভ্য প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সেসব ঘটনা দেখে থাকলেও নিশ্চয়ই তা তাদের মন থেকে একসময় মুছে গেছিলো। তবুও দেশবিদেশের উপকথা আর পৌরাণিক গল্পগাথায় আমরা দেখতে পাই সমুদ্রে শুকিয়ে যাওয়া কিংবা সমুদ্রের প্লাবনে মহাদেশগুলির ডুবে যাওয়ার বিচিত্র সব কাহিনী।

বিশ্বকর্মার ছেলে বিশ্বরূপ। মনে সাধ জাগলো তাঁর, ইন্দ্রত্বলাভ করার। স্বর্গের অধিপতি হওয়ার জন্য তিনি শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। পাছে তাঁর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয়, এই ভয়ে ইন্দ্র আতঙ্কিত হয়ে মেরে ফেললেন বিশ্বরূপকে।

দাদার এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা কানে আসতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বললো ভাই বৃত্রাসুরের মাথায়। সম্মুখ যুদ্ধে তিনি আহ্বান করলেন ইন্দ্রকে। মানস সরোবরের উত্তর তীরের পাহাড়ে ইন্দ্রের সৈন্যসামন্তের সঙ্গে বৃত্রাসুরের যুদ্ধ চললো একটানা একশো বছর ধরে। ব্রহ্মার বরে বৃত্রাসুর প্রায় অজেয়, অমর; লোহা, কাঠ বা পাথরের অস্ত্রে তাঁর মৃত্যু হবে না। শেষমেশ ইন্দ্রেরই হার হলো; স্বর্গের সিংহাসন দখল করলেন বৃত্রাসুর।

বেচারী ইন্দ্র তো স্বর্গরাজ্য হারিয়ে খুবই মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ান; দেবতারা তাঁকে পরামর্শ দিলেন বৃত্রাসুরের সঙ্গে সন্ধি করার। বৃত্রাসুরের কাছে গিয়ে ইন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন—দিনে বা রাতে, কোনো অস্ত্রের সাহায্যে কখনও তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করার চেষ্টা করবেন না। সন্ধির এই সর্ত অবশ্য শেষ পর্যন্ত মানেননি ইন্দ্র। একদিন সন্ধ্যেবেলায় দিন ও রাত্রির ঠিক সন্ধিক্ষণে তিনি বজ্রের সাহায্যে মেরে ফেললেন বৃত্রাসুরকে। আবার দখল করলেন স্বর্গরাজ্য।

বৃত্রাসুর মারা যেতেই 'কালকেয়' নামে তাঁর সব অনুচররা গিয়ে লুকলো অতল সাগরের জলের গভীরে। তাদের মনে তখন সবসময়ই জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন, অন্যায়ভাবে তাদের রাজাকে হত্যা করার জন্যে। তাই মাঝে মাঝেই গভীর রাত্রে নিঃশব্দে তারা উঠে আসে ডাঙায়, লুঠতরাজ আক্রমণ চালায় নির্বিচারে। অথচ, সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিলো বলে তারা ছিলো দেবতাদেরও ধরাছোঁয়ার বাইরে। উপায় না দেখে দেবতারা গিয়ে অগস্ত্যমুনির শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের সকাতর অনুনয়ে ভয়ঙ্কর তেজস্বী অগস্ত্যমুনি সমুদ্রের সব জল এক-চুমুকে চোঁ-চোঁ করে পান করে ফেললেন। সমুদ্র হয়ে গেল খটখটে শুকনো। অসুরদের আর লুকোবার জায়গা রইলো না। ব্যস! দেবতাদের হাতে চটপট মারা পড়লো তারা।

সাগর শুকিয়ে যাওয়ার এইরকম বিচিত্র গল্পের পাশা-

পাশি মহাপ্লাবনের গল্পও আছে আমাদের ভারতীয় পুরাণেই।

মানবজাতির আদিপুরুষ 'মনু' জানতেন—একদিন সমুদ্রের প্লাবনে গোটা পৃথিবীটাই ডুবে যাবে। প্লাবন যখন এলো, মুনিঋষিরা তখন নানা ধরনের শষ্যবীজ আর মনুকে নিয়ে একটা নৌকোয় উঠলেন। দড়ির বদলে সাপ দিয়ে সেই নৌকো বাঁধা হলো প্রকান্ড এক মাছের দুই শিঙের সাথে! শিঙ্-ওয়ালা সেই মাছটা আসলে ছিলেন বিষ্ণু নিজেই; মৎস্য-অবতারের রূপ নিয়ে তিনি নিজেই বাঁচাতে এসেছিলেন মানবজাতির আদি পুরুষকে। মহাপ্লাবনের পর ধীরে ধীরে যখন জল কমে এলো —নৌকো গিয়ে নোঙগর করলো সমুদ্রের বুকে নতুন জেগে ওঠা ডাঙগায়।

এমনধারা আশ্চর্যসুন্দর গল্পের হদিশ মেলে বাইবেলেও! সেখানেও 'নোয়া'র জাহাজে যারা আশ্রয় নিয়েছিলো—শুধু সেইসব মানুষ, গাছপালা আর পশুপাখী মহাপ্লাবনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলো।

'অ্যাটল্যাণ্টিস'-এর ডুবে যাওয়ার ঘটনাও ইঙ্গিত দেয় মহাপ্লাবনের। দার্শনিক প্লেটোর বিবরণ থেকে জানা যায়—এখন থেকে প্রায় ১১,০০০ বছর আগে এশিয়া- মাইনর-এর চেয়েও বড় এক শক্তিশালী দেশের অস্তিত্ব ছিলো। প্লেটোর বর্ণনামতো, সাগর-দিয়ে ঘেরা সেই বিশাল দেশটার অবস্থান ছিলো হারকিউলিসের স্তম্ভগুলির বাইরে। অ্যাটল্যান্টিসের প্রচন্ড যুদ্ধকুশলী যোদ্ধাদের ভয় পেতো ভূমধ্য সাগরের চারপাশের দেশগুলি, কারণ ওরা প্রায়ই হানা দিতো ভূ-মধ্য সাগরের উপকূলে আফ্রিকা আর ইয়োরোপের দেশগুলোয়। একসময় গোটা 'লিবিয়া'-কেই নিজেদের দখলে এনে ফেলেছিলো ওরা। তখনকার দিনে একমাত্র এথেন্স-ই অ্যাট-ল্যান্টিস-এর সঙ্গে সমানে-সমানে যুদ্ধ চালাতে পেরেছে। কিন্তু প্রকৃতির কাছে মানুষ তো তুচ্ছ। প্রচন্ড ভূমিকম্পের ফলে মাত্র একদিন-একরাতের মধ্যেই গোটা অ্যাটল্যাণ্টিস দেশ-টাই ডুবে গেলো সমুদ্রের গভীরে, হারিয়ে গেলো চিরকালের মতো।

ইয়োরোপের মানুষ দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে প্লেটোর কথাগুলো বিশ্বাস করে এসেছে, অ্যাটলাণ্টিসের খোঁজে ভূ-মধ্য সাগরের তলায় অগুন্তি অভিযান চালিয়েছে, তোলপাড় করেছে সমুদ্র, কিন্তু হদিশ মেলে নি হারিয়ে যাওয়া দেশের। বিজ্ঞানী-দের অনেকের অবশ্য এখন ধারণা, পুরনো যুগের সেই অ্যাট-ল্যাণ্টিসই হয়তো আজকের প্যালেস্টাইন বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দ্বীপপুঞ্জ কিংবা আমেরিকা, যা একসময় সমুদ্রে তলিয়ে গেলেও প্লাবনের জল সরে যাওয়া মাত্রই আজকের নতুন চেহারায় আবার ফিরে এসেছে।

অ্যাটল্যান্টিসের ব্যাপারটা যে নেহাতই প্লেটোর বানানো গল্প নয়, তার কিছু কিছু প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন গ্রীকসভ্যতার যে সব নিদর্শন পেয়েছেন তার মধ্যে গ্রীসের আদি মানুষদের লেখার কিছু নমুনাও পাওয়া গেছে। ঐসব রচনার ভাষা গ্রীক নয়, এবং যেসময় ওগুলো লেখা হয়েছে তখন গ্রীক বর্ণমালার আদৌ সৃষ্টিই হয় নি। তাহলে কি ধরে নিতে হয়—গ্রীকদেরও আগে একদল উন্নত সভ্য মানুষদের সাথে ইয়োরোপ-বাসীদের যোগাযোগ ঘটেছিলো? ঐসব সভ্য মানুষরাই কি তবে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া অ্যাটল্যান্টিস মহাদেশের অধিবাসী?

হাল আমলে অ্যাটল্যান্টিসকে ঘিরে নতুন এক তত্ত্ব হাজির করেছেন জনৈক অভিযাত্রী রিচার্ড উইনগেট। উনি বলেছেন, অ্যাটল্যান্টিস ডুবে যাওয়ার ঢের আগেই ওখানকার অধিবাসীরা সেই বিপর্যয়ের আগাম ইঙ্গিত পেয়েছিলো—ফলে অনেকেই তাদের দেশটা সমুদ্রে সম্পূর্ণ তলিয়ে যাওয়ার আগেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি ইকুয়াডর-এর চার্চ পরিদর্শনে গিয়ে ঐ চার্চের মিউজিয়ামে রাখা প্রাচীন যুগের কিছু নিদর্শন দেখে অ্যাটল্যান্টিসকে নিয়ে নতুন চিন্তাটা এসেছে উইনগেটের মনে। মিউজিয়ামে রাখা

প্রাচীন জিনিসগুলির মধ্যে রয়েছে ইজিপ্টের মমি, ফিনিশীয় ক্যালেন্ডার, হাজার হাজার বছর আগে আফ্রিকার সৈন্যদের ব্যবহৃত যুদ্ধের সাজপোষাক, হিব্রুভাষায় খোদাই করা বাক্স-পত্তর—এমনি আরো অনেক কিছু। এগুলির সবই মিলেছে স্থানীয় গুহাগুলিতে। পৃথিবীর দেশবিদেশের প্রাচীন সামগ্রী কি করে ইকুয়াডরের জঙ্গলে এসে হাজির হলো, সে রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে উইনগেটের মনে হয়েছে, সম্ভবতঃ দেশ-বিদেশের এই সব সামগ্রীগুলিকে অ্যাটল্যান্টিসের অধিবাসীরাই সাগর পেরিয়ে নিয়ে এসেছিলো দক্ষিণ আমেরিকায়।

উইনগেটের এই ধারণার পিছনে যুক্তিও আছে। কারণ, বেশ কিছু দেশের উপকথায় বলা হয়েছে, সেইসব দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা নাকি অতলান্তিক মহাসাগরের কোনও বিশেষ অঞ্চল থেকে এসেছিলেন।

মেক্সিকোর আজটেকেরা বলে, তাদের প্রাচীন পিতৃভূমির নাম নাকি—'আজ্টলান'; পেরুর ইনকা উপজাতির উপকথায় 'অ্যাটল্যান্ড'-এর কথা বলা হয়েছে; ভেনেজুয়েলার অধিবাসীরা এখনও তাদের গানের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন 'অ্যাটলান' দেশের কথা বলে। মিশরীয় উপকথায় বলা হয় —'টথ' নামে মিশরীয়-দের আদিপুরুষ নাকি এক শক্তিশালী গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি যখন তার দেশ ছেড়ে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন এক দৈববাণী শুনেছিলেন, "তুমি তোমার দেশ ছেড়ে যাচ্ছো, ফিরে আসার আগেই তোমার ঐ দেশ সাগরের তলায় নিখোঁজ হয়ে যাবে।"

শুধু অ্যাটল্যান্টিসই নয়, বিজ্ঞানীদের অনেকেরই অনু-মান—গত কয়েক হাজার বছরে মহাসাগর গুলোয় তলিয়ে গেছে অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ। কে বলতে পারে, হারিয়ে যাওয়া সেই সব দ্বীপের পথ ধরে এশিয়া-ইয়োরোপের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ একদিন অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা আর ওশিয়ানিয়ার দ্বীপগুলোয় পাড়ি দিয়েছিলো কিনা!

১৫৭৮ সাল। প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে চলেছেন জুয়ান ফারনানডেজ্। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক অজানা দেশের দেখা পেলেন উনি। জাহাজ নোঙ্গর করলেন না, কিন্তু দেখতে পেলেন অনেক-গুলি বড় বড় নদীর মোহানা। দূর থেকে সেই অজানা দেশের মানুষদেরও দেখা পেলেন ফারনানডেজ্; গায়ের রঙ্ ধবধবে সাদা, পরনে সুন্দর পোষাক, আমেরিকার অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের কোনও মিল নেই। ওসিয়ানিয়ার দ্বীপগুলো সম্পর্কে তখন কারোর কোনও ধারণা ছিলো না। জুয়ান ফারনানডেজ্ ভাবলেন, তিনি বুঝি নতুন এক মহাদেশের সন্ধান পেয়ে গেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি-তে ফিরে গিয়ে নতুন করে অভিযান শুরু করার আগেই হঠাৎ মারা গেলেন ফারনানডেজ্। তাঁর আবিষ্কারের কথাও লোকে ভুলে গেলো অল্পদিনের মধ্যেই।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপটেন ডেভিস নামে এক বোম্বেটে জলদস্যু গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে সোজাসুজি দক্ষিণে ভেসে যেতে যেতে ২৭ ডিগ্রি ২০ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশে চিলির উপকূল থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূরে এক বিস্তীর্ণ সমুদ্রতট দেখতে পান; সমুদ্রের পাড়ের বালিয়াড়ি থেকে পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার দূরে ডাঙ্গাজমি দেখা যাচ্ছিলো।

এরপর ১৭২২ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল রোগেভিন নামে এক নাবিক ঐ একই জায়গায় আবিষ্কার করলেন একটুকরো ডাঙ্গাজমি—নাম দিলেন 'ইস্টার দ্বীপ'। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিনটি এবং পূর্ব উপকূলে একটা ছোট্ট দ্বীপ ছাড়া ইস্টার দ্বীপের চারদিকে কোনও জমির চিহ্ন দেখা গেলো না।

তাহলে মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে উদরসাৎ করেছে বলেই ধরে নিতে হয়। এই মতের অবশ্য আরো যুক্তি আছে।

ইংরেজরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম যখন ইস্টার দ্বীপে আসে, তারা অবাক হয়ে দেখেছিলো, সমুদ্রের দিকে পেছন

ফিরিয়ে সারি সারি দাঁড় করানো রয়েছে বিশাল আকারের মানুষের মূর্তি। পাথর কুঁদে তৈরী। পাথরের বেদীর উপর দাঁড়-করানো ঐ মূর্তিগুলির কানগুলো অস্বাভাবিক লম্বা, আর মাথায় ছিলো পাথরের টুপি। পাশেই কাঠের ফলকের গায়ে খোদাই করা ছিলো এমন এক ভাষা যার পাঠোদ্ধার কোনকালে সম্ভব হয় নি।

সমুদ্রতট ছাড়াও ইস্টার দ্বীপেরই এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ঐ জাতীয় পাথরের মূর্তির সন্ধান মিলেছে— মোট সংখ্যা প্রায় ছ'শো। মূর্তিগুলির উচ্চতা প্রায় ২১ মিটার তার মধ্যে মাথাটাই ১১ মিটার উঁচু; নাকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মিটার। মূর্তিগুলো খোদাই করা হয়েছিলো আদিমযুগের ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে। আরও আশ্চর্য, মূর্তিগুলিকে, যাদের টুপির ওজন ৩০ টন, বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সমুদ্রের ধারে। অথচ ছোট্ট দ্বীপটার লোকসংখ্যা খুবই নগণ্য। অতগুলো দৈত্যাকৃতি মূর্তি আর তাদের বেদী বানাতে নিশ্চয় হাজার হাজার মানুষের দরকার হয়েছিলো। কোথেকে এলো তারা?

ইস্টার দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে যে উপকথা চালু আছে তাতে বলা হয়—দ্বীপটা নাকি একসময় ছিলো মস্ত বড় এক দেশ; 'ইউয়োক' নামে এক দৈত্য তার যাদুদণ্ড দিয়ে সমুদ্রের জলকে ফাঁপিয়ে তুললো—আর তাতেই নাকি দেশটা হয়ে গেলো ছোট্ট একটা দ্বীপ।

শুধু রূপকথাই নয়, আজও ইস্টারদ্বীপে অনেক শান-বাঁধানো রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়; এদের কতকগুলো সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে! তাহলে কি ধরে নেওয়া যায়—একসময় ঐ রাস্তাগুলো দিয়ে এমন অনেক জায়গায় যাওয়া যেতো যার সবই পরে তলিয়ে গেছে সমুদ্রে?

পণ্ডিতদের হিসেব মতো, ইস্টার দ্বীপের মূর্তিগুলি খোদাই-এর কাজ শুরু হয়েছিলো ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পর। ভাবলে অবাক লাগে—সমুদ্রের খেয়াল খুশীতে একটা গোটা সভ্যতা লুপ্ত হয়ে গেছে মাত্র ছ'শো বছরের মধ্যে!

আমাদের দেশের দক্ষিণে রয়েছে যে তামিলনাড়ু প্রদেশ, সেখানকার লোকদের বিশ্বাস, তাদের আদি বাসভূমি ছিলো নওয়ালম দ্বীপে। তামিলরা দ্রাবিড় শ্রেণীর। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার ঢের আগে থেকে দ্রাবিড়রা এদেশে বসবাস করলেও তারাও সকলে ভারতের আদি অধিবাসী নয়। তামিলনাড়ুর প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, তামিলরা এসেছিলো নিরক্ষ-রেখার কাছে জেগে ওঠা এক ভূ-ভাগ থেকে।

অনেকে আজ মনে করেন, তামিলদের আদি বাসভূমি ছিলো 'লিমুরিয়া' নামে ভারত মহাসাগরে ডুবে যাওয়া মহা-দেশের এক অংশে। বিবর্তনের ধারায় প্রথম মানুষের আবির্ভাব সম্ভবতঃ ঐ 'লিমুরিয়া' মহাদেশেই ঘটেছিলো। কারো কারো মতে এই মহাদেশ বিস্তৃত ছিলো ভারত, সিংহল, মাডাগাস্কার থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত।

আবার অখণ্ড এক মহাদেশের বদলে 'লিমুরিয়া' ছিলো ভারত থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি—তেমন সম্ভাবনার কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। না হলে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সাথে কালো দ্রাবিড়-দের চেহারা-চরিত্রে এত মিল কেন?

ভারতের আদিবাসীরা প্রস্তর যুগের নড়বড়ে ভেলায় চড়ে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় পেঁছেছিলো, এমন কথা বিশ্বাস করা বেশ শক্ত নয় কি? সে দিক থেকে দ্বীপ-মালার রাস্তা ধরেই মানুষ যে অষ্ট্রেলিয়ায় পেঁছেছিলো, এমন সম্ভাবনাকে কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? একসময় ভারত মহাসাগরের বুকে জেগে থাকা ঐসব দ্বীপ কেন জলের তলায় হারিয়ে গেলো তা আজও গভীর রহস্য।

অ্যাটল্যাণ্টিস বা লিমুরিয়ার সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ঘটনা রূপকথা হয়ে থাকলেও, সাগরের তলায় এমন জায়গারও সন্ধান মিলেছে যা সত্যিই একসময় বড়সড় এক দেশ ছিলো।

উত্তর-সাগরের ঐ জায়গাটার নাম 'ডগার ব্যাংক'—মাছের প্রাচুর্যের জন্য জেলে মহলে যা রীতিমতো বিখ্যাত। সম্ভবতঃ প্লিস্টোসিন যুগে, যখন উত্তর গোলার্ধে পুরু বরফ জমার ফলে সাগরের জল নেমে গেলো, বিস্তীর্ণ এক ডাঙ্গাজমি বেরিয়ে এলো উত্তর সাগরের বুক থেকে—আয়তনে যা ডেনমার্কের চেয়েও বড়। আস্তে আস্তে আশপাশের উঁচু দ্বীপ থেকে গাছ-পালার বীজ ভেসে এলো; বনজঙ্গলে ছেয়ে গেলো গোটা দ্বীপটা। জন্তু-জানোয়ারও জল সাঁতরে আসতে শুরু করলো সেই দ্বীপে; এলো নেকড়ে বাঘ, হায়েনা, বুনো ষাঁড়, বাইসন; এলো প্রস্তর যুগের মানুষ।

অনেক অনেক বছর পর যেই আবার উত্তর মেরুর বরফ গলে সাগরে জল বাড়তে শুরু করলো—অমনি আবার একটু একটু করে ডুবে যেতে থাকলো সেই দেশ। আদিম মানুষরা নিশ্চয়ই আসন্ন ধ্বংস আঁচ করে আগেই পালিয়েছিলো মূল ভূখণ্ডে। তবে সলিল-সমাধির হাত থেকে বাঁচতে পারলো না গাছপালা আর অন্যান্য জন্তু জানোয়ার।

উত্তর-সাগরে এক বড়সড় দেশ ডুবে যাওয়ার ঘটনা ইয়োরোপের মানুষ শুনে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে; ব্যাপারটা প্রায় রূপকথার মতোই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। বছর পঞ্চাশেক আগে ইয়োরোপের জেলেরা 'ডগার ব্যাঙ্ক' অঞ্চলে মাছ ধরতে গিয়ে, জলের মাত্র পনেরো-বিশ মিটার তলায় বিস্তীর্ণ এক এলাকার সন্ধান পায়। নানা জাতের মাছের বিচরণের পক্ষে আদর্শ ঐ জায়গাটা আয়তনে ডেনমার্কের চেয়ে মোটেও কম নয়। জেলেদেরই জালে মাছের ঝাঁকের সাথে ধরা পড়লো জন্তু জানোয়ারের হাড়, মরে যাওয়া গাছপালার অবশিষ্টাংশ আর পাথরের সব যন্ত্রপাতি—মানুষ যা একদিন ব্যবহার করেছিলো। সত্যি বললে, 'ডগার ব্যাংক'-এ লুপ্ত দেশের সন্ধান পাওয়ার পর অ্যাটল্যাণ্টিস বা লিমুরিয়াকে আর কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর সেজন্যেই সমুদ্রের উপকূল বরাবর জলের তলায় মানুষের লুপ্ত বসতির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করার চেষ্টাও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে জোরকদমে।

চার
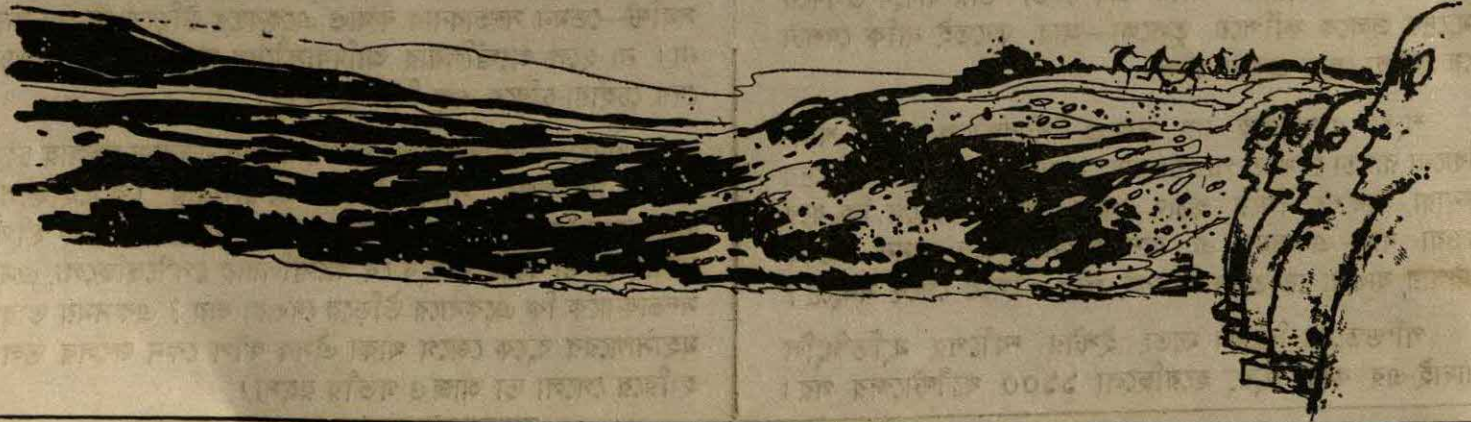
১৫২০ সালের নভেম্বর। আমেরিকাকে ডাইনে রেখে অতলান্তিক মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে এক ঝাঁক জাহাজ। ডেকে দাঁড়িয়ে নৌবহরের নেতা ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান। দূরবীনে তাঁর চোখ নিবদ্ধ দিগন্তবিসারী সমুদ্রের দিকে। মনে চলেছে নানান চিন্তার ঢেউ। বালমোয়ার কথা কি সত্যি? নাকি কল্পনা?

স্পেনের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী নুনেজ বালমোয়া আমেরিকার পশ্চিম দিকে এক নতুন সমুদ্রের সন্ধান পেয়েছেন বলে খবর রটেছিলো গোটা ইয়োরোপে। বালমোয়া নাকি তাঁর পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একবার এক জাহাজের খোলের মধ্যে রাখা ঝুড়িতে লুকিয়ে আমেরিকা পালান এবং সেখানেই ছোট একটা দল গড়ে নিয়ে জলপথে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে গিয়ে পৌঁছোন। ইয়োরোপে ফিরে এসে বালমোয়া বলেছিলেন, আমেরিকার পূর্বদিকের অতলান্তিক মহাসাগর থেকে পশ্চিমের সেই নতুন সমুদ্রে গিয়ে পড়ার জন্য এক সঙ্কীর্ণ প্রণালী তিনি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু নানান কারণে স্পেনের রাজার আদেশে বছর কয়েক আগে বালমোয়ার ফাঁসি হয়ে গেছে এবং ইয়োরোপের কোনও দেশই বালমোয়ার দেখা নতুন সমুদ্রের ব্যাপারে উৎসাহী নয়।

ম্যাগেলান নিজে কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, বালমোয়ার পথ ধরে একবার সেই নতুন সমুদ্রে গিয়ে পড়লে ভারতবর্ষে যাবার একটা সহজ পথ নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। বছর কয়েক আগে ভাস্কো-দা-গামা অবশ্য ভারতে যাবার সমুদ্র-পথ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু সে তো আফ্রিকাকে বেড় দিয়ে পূর্ব দিকের ঘুরপথ। পৃথিবী যখন গোল, তখন নিশ্চয়ই পশ্চিম দিক ধরেও ভারতবর্ষে পৌঁছোনো সম্ভব।

নিজের দেশ পর্তুগালের রাজাকে রাজী করাতে না পারলেও, স্পেনের রাজা সেই নতুন পথ খুঁজে বের করার জন্য টাকা খরচ করতে পেছপা ছিলেন না। কারণ ভারতবর্ষ সোনার দেশ, সেখানে ব্যবসাপত্রের অঢেল সুযোগ! তাছাড়া পর্তুগালের সঙ্গে স্পেনের তখন দারুণ রেষারেষি চলেছে। সুতরাং বেশ জাঁকজমক করে জাহাজ বোঝাই লোকলস্কর মাঝি-মাল্লা নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছেন ম্যাগেলান।

উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার ঠিক মাঝখানে রয়েছে যে পানামা-যোজক তারই মধ্যে দিয়ে জাহাজ চালিয়ে আমেরিকার পূর্ব থেকে পশ্চিম উপকূলে গিয়ে পড়েছিলেন বালমোয়া। সে পথ অবশ্য খুঁজে পেলেন না ম্যাগেলান। প্রায় মাসদুয়েক ধরে ক্রমাগতঃ দক্ষিণ দিকে চলার পর দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে আঁকাবাঁকা এক প্রণালীর সন্ধান মিললো —ম্যাগেলানের নামে পরে যার নামকরণ হয়।

সেই প্রণালী ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একসময় ম্যাগেলান গিয়ে পড়লেন অকূল অথৈ সমুদ্রে। তিনি

দেখলেন, নামে সমুদ্র হলেও অতলান্তিক বা ভূমধ্য-সাগরের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই; সমুদ্রের ঢেউগুলি নেহাতই ছোট, জল যেন শান্ত সমাহিত। ম্যাগেলান সেই সমুদ্রের স্বভাবের সঙ্গে মিল রেখে তার নাম রাখলেন Pacific Ocean বা প্রশান্ত মহাসাগর।

দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে শেষপ্রান্তের সেই আঁকা বাঁকা প্রণালী ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ম্যাগেলানের ধারণা হলো, নতুন এক মহাদেশ বুঝি তিনি আবিষ্কার করেছেন। সেই নতুন মহাদেশের তিনি নামও দিয়ে দিলেন 'টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো'। ওটা যে আদৌ মহাদেশ নয়, বড়সড় নেহাত দ্বীপ মাত্র—সেটা জানতে সময় লেগেছিলো আড়াইশো বছরেরও বেশী।

প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত জলে জাহাজগুলোকে পশ্চিম দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ম্যাগেলান। পথে পড়লো ওসিয়ানিয়ার দ্বীপগুলি। ওখানকার আদিম মানুষরা ম্যাগেলানের আগে কখনও কোনও ইয়োরোপীয়কে দেখে নি; স্বভাবতঃই অবাক হয়েছিলো তারা। অবাক হয়েছিলেন ম্যাগেলান নিজেও। ওসিয়ানিয়ার দ্বীপগুলি একে অপরের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও কি করে আদিম মানুষরা এসে বসবাস শুরু করলো ঐসব দ্বীপে তার কোনও উত্তর খুঁজে পান নি ম্যাগেলান।

ওসিয়ানিয়া থেকে এশিয়া তথা ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেও কোনদিনই সেখানে পৌঁছোতে পারেন নি ম্যাগেলান। ফিলিপাইনের দুর্ভেদ্য অরণ্যে হিংস্র আদিবাসীদের হাতে মারা পড়েন তিনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাগেলানের নৌবহরের একটি মাত্র জাহাজ ভারত মহাসাগর আর অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনে ফিরে আসতে পেরেছিলো। অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও, পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলি যে অবিচ্ছেদ্য, সমুদ্রপথে যে গোটা পৃথিবীটাকে চক্কোর দেওয়া যায়—ম্যাগেলানের ঐতিহাসিক অভিযানই তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলো।

ভারত আর চীনের কথা বাদ দিলে খ্রীষ্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগে প্রাচীন সব সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো ভূমধ্য-সাগরের আশেপাশে—ইয়োরোপ আর আফ্রিকার উপকূলে। প্রাচীন ভারতীয়রা সাগর পাড়ি দিয়ে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, কম্বোজ ইত্যাদি দেশগুলোয় যাতায়াত করলেও, ভারতের সঙ্গে ইয়োরোপের যোগাযোগটা হয়েছিলো স্থলপথে, আরবদের মারফৎ। তার আগে পর্যন্ত ভূমধ্য-সাগরের আশপাশের লোকেরা ভাবতো, ভূমধ্য-সাগর যেখানে গিয়ে মহাসমুদ্রে মিশেছে সেটাই হলো পৃথিবীর সীমানা।

প্রাচীন গ্রীকদের কাছে মহাসাগর ছিলো এক অনন্ত জলধারা যা কিনা পৃথিবীর শেষপ্রান্তে চাকার মতো অবিরাম ঘুরে চলেছে। ওরা গভীরভাবে বিশ্বাস করতো, কেউ যদি কখনো মহাসাগর পেরিয়ে যেতে পারে তবে সে গিয়ে পৌঁছবে কুয়াশায় ঘেরা এক অন্ধকার দেশে যেখানে সমুদ্র আর আকাশ একাকার হয়ে গেছে। সে আর কোনদিনই সেই চির অন্ধকারের দেশ থেকে তার পুরনো পৃথিবীতে ফিরতে পারবে না!

প্রাচীন মিশর, রোম বা গ্রীসের মানুষ ভূমধ্য সাগর ছাড়া অন্য কোনও সাগর-মহাসাগর না দেখে থাকলেও, তাদের ভূমধ্য সাগর যে একটা অনন্ত মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে সে কথা শুনেছিলো ফিনিশীয়দের কাছ থেকে।

খ্রীষ্টজন্মের দু'হাজার বছর আগেও ফিনিশীয় ব্যবসায়ীরা যে পণ্য নিয়ে ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলিতে যাতায়াত করতো তার প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। খুব সম্ভবতঃ ওরাই প্রথম বড় বড় নৌকোয় চেপে সমুদ্র পাড়ি দেয়। লোহিত সাগর থেকে যাত্রা শুরু করে সিরিয়া, সোমালিল্যান্ড, আরব এমনকি ভারত এবং চীনের উপকূলেও পসরা নিয়ে হাজির হতো ওরা; ফিরে আসতো সোনা-রুপো, মণিমুক্তা,

রান্নার মশলাপাতি আর অজানা দেশের অচেনা মানুষদের নানান খোঁজখবর সঙ্গে নিয়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে 'হিমিলকো' নামে কার্তেজের এক অভিযাত্রীর কথা পাওয়া যায় প্রাচীন রোমান সাহিত্যে। হিমিলকো জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্যে দিয়ে অতলান্তিকের উত্তর দিকে পাড়ি দেন। দেশে ফিরে এসে তিনি শুনিয়েছিলেন সামুদ্রিক দৈত্যদের কথা, যারা তাঁর জাহাজের পাশে পাশে সাঁতরে চলতো। আজ মনে হয়, হিমিলকো ফ্রান্সের উপকূলে বিস্‌কে উপসাগরের অতিকায় তিমিদেরই সামুদ্রিক দৈত্য ভেবেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে 'পাইথিয়াস' নামে মার্সিলিয়ার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম বড়োসড়ো সমুদ্র অভিযানে বেরোন। পাইথিয়াস যে উত্তরে পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে তাঁর যাত্রাপথ ঠিক করেছিলেন এমন প্রমাণ রয়েছে। 'টিন দ্বীপপুঞ্জে'—অর্থাৎ এখনকার ব্রিটেনে পৌঁছে তিনি শক্তিশালী জোয়ার লক্ষ্য করেন এবং চাঁদের কলার সঙ্গে সেই জোয়ারের বাড়াকমার একটা সম্পর্ক খুঁজে পান। এরপর আরো উত্তর দিকে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়ে পৌঁছোন 'থুল'-এ—যাকে পাইথিয়াস বলেছেন 'নিশীথ-সূর্যের দেশ'। কেউ কেউ বলেন, পাইথিয়াসের 'থুল' আসলে আজকের নরওয়ে। আবার কারো কারো মতে, উনি আসলে পৌঁছে-ছিলেন 'আইসল্যান্ডে'—কারণ 'থুল'-এর উত্তরে জমাট বাঁধা এক সমুদ্র তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যা আসলে সুমেরু সাগর ছাড়া আর কিছুই নয়।

সন্ধ্যার সময় লাল গনগনে সূর্য যখন ডুবে যায় পশ্চিম-দিগন্তের মহাসাগরে, তখন ওরকম প্রচণ্ড তাপ নিভোতে জলে নিশ্চয়ই হিস্‌-হিস্‌ শব্দ হয়! আজ হাসি পায়, সেযুগের মানুষের উদ্ভট কল্পনার বহর দেখে। অথচ এটা সত্যি কিনা যাচাই করতেই ভূমধ্য সাগরের রোড্‌স্‌ দ্বীপ থেকে খ্রীষ্ট-

১৫১৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর স্পেনীয় অভিযাত্রী **ভাস্কো নুনেজ দ্য বালবোয়া** ইয়োরোপীয় হিসেবে প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরের দেখা পান।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস
(১৪৫১-১৫০৬)

মোট চারবারের সমুদ্র অভিযানে কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন সাহারা দ্বীপপুঞ্জ, কিউবা, হাইতি, ত্রিনিদাদ এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপ। কলম্বাস তাঁর তৃতীয় অভিযানের সময় আমেরিকার ভেনেজুয়েলা উপকূলে পৌঁছোন ১৪৯৮ সালে।

পূর্ব ১০০ বছর আগে লোকলস্কর নিয়ে জাহাজ ভাসালেন এক ভূগোলবিদ্, নাম পাজিডনিয়াস। সূর্যের ডোবার জায়গা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে বেচারী শেষতক এসে পৌঁছোলেন স্পেনের 'কাডিজ' অঞ্চলে। এ অভিযানের তেমন কোন বিবরণ মেলে না।

পাইথিয়াসের পর সমুদ্র অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায় যাঁর কাছ থেকে তাঁর নাম 'অটার'। ৮৭০ থেকে ৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে নরওয়ের ঐ দুঃসাহসিক অভিযাত্রী নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় উত্তর-মেরু সাগরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। তিনিই প্রথম উত্তর মেরু সাগরের মধ্যে দিয়ে জাহাজ চালিয়ে 'হোয়াইট-সী'-তে গিয়ে পড়েন এবং উত্তর মেরুর কাছাকাছি 'নোভায়া জিম্‌লায়া' পর্যন্ত পৌঁছোন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এশিয়া, আফ্রিকা এমনকি দক্ষিণ ইয়োরোপের রাজ্যগুলিও আরব-এর দখলে চলে আসে। সেইসাথে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের অর্জিত জ্ঞানেরও দখলদারি নেয় আরবরা। সেই জ্ঞানের বলেই আরবরা সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে দেয় ভারত, চীন আর আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দেশগুলির সাথে। খ্রীষ্টজন্মের ১০০০ বছরের মধ্যে ভারত মহাসাগরে চলাফেরার ব্যাপারে আরবের নাবিকরা তো রীতিমতো দক্ষই হয়ে উঠেছিলো।

ইতিমধ্যে অবশ্য 'ভাইকিং'-নামে স্ক্যান্ডিনেভিয়-অভিযাত্রীদের দিন শুরু হয়ে গেছে। নরওয়ের ঐসব অসমসাহসী মানুষরা তাদের জাহাজে ড্রাগন-আঁকা পাল তুলে তোলপাড় করছে গোটা অতলান্তিক মহাসাগর। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভাইকিং-রা অতলান্তিক পেরিয়ে গ্রীণল্যান্ড আর উত্তর আমেরিকার উপকূলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দী থেকেই স্ক্যান্ডিনেভিয় অভিযাত্রীরা যে তাদের মজবুত জাহাজে চেপে সাগর-মহাসাগর চষে বেড়াচ্ছে সেখবর বেশ কয়েকশো বছর ধরে ভূমধ্য সাগরের আশেপাশের মানুষেরা জানতো না। ভাবলে অবাক লাগে, মাত্র আটশো ত্রিশ বছর আগেও ১১৫৪ সালে 'ইদ্রিসি' নামে আরবের এক নামকরা ভূগোলবিদ্ যখন সিসিলির রাজাকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ৭০টা মানচিত্র পাঠালেন, সেইসব মানচিত্রেও মহাসমুদ্রকে রাখলেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, যাকে আর পেরিয়ে যাওয়া যায় না!

সত্যি বললে, স্পেনীয় রাজাদের সহযোগিতায়, শ'পাঁচেক বছর আগে কলম্বাস যদি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পৌঁছোনোর জন্য বের না হতেন, তবে ইয়োরোপের মানুষকে আরও কতকাল যে সমুদ্রকে ঘিরে অদ্ভুত সব রূপকথার রাজ্যে বাস করতে হতো কে জানে! কলম্বাস তাঁর তৃতীয় সমুদ্র অভিযানে ল্যাটিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলার উপকূল স্পর্শ করেছিলেন বলতে গেলে এই সেদিন ১৪৯৮ সালে। অথচ তার কত শতাব্দী আগে থেকেই পৃথিবীর আর এক প্রান্তের মানুষ সমুদ্র সম্পর্কে যাবতীয় ভয়কে মন থেকে মুছে ফেলে প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগরে তরী ভাসিয়েছে।

সেই কোন্ প্রাচীন কাল থেকেই আমেরিকার আদি-বাসীরা স্রোত এবং অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের 'ইস্টার' এবং অন্যান্য দ্বীপে যাতায়াত করেছে। সমুদ্র যখন থাকতো শান্ত আর আকাশ থাকতো পরিষ্কার, তখন আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক্ ঠিক করে পলিনেশীয়রা তাদের মজবুত ভেলায় চেপে পাড়ি জমাতো এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে।

সম্প্রতি জানা গেছে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ 'ভিটি লেভু'-তে মানুষ প্রথম উপনিবেশ গড়েছিলো খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে; পরবর্তীকালে মানুষ গিয়ে পৌঁছয় মারকুইসাস দ্বীপে—খ্রীষ্টপূর্ব ১২৪ অব্দে এবং ইস্টার দ্বীপে—৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। পলিনেশীয়দের শেষ উপনিবেশ বসেছে হাওয়াই

দ্বীপপুঞ্জ আর নিউজিল্যান্ডে। সেও প্রায় ১২০০ বছর আগেকার কথা।

আবার, প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলের চীনা অধিবাসীরা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকেই উপকূল রেখা ধরে সমুদ্র যাত্রা করেছে; ওরা পাড়ি জমিয়েছিলো ভারতবর্ষ, আরব এবং সম্ভবতঃ উত্তর আমেরিকায়।

এসব অভিযানের খবর ইয়োরোপে পৌঁছোয়নি। তারা তখন পড়ে আছে অনেক, অনেক পেছনে, কল্প-গল্পের জগতে। তারপর যেই কলম্বাস ওয়েস্ট-ইন্ডিজে পৌঁছোনোর রাস্তা আবিষ্কার করলেন, বালমোয়া প্রশান্ত মহাসাগরকে নিজের চোখে দেখলেন আর ম্যাগেলানের জাহাজ সমুদ্রপথে গোটা পৃথিবীটাকে মোটামুটি পাক দিয়ে এলো অমনি সমুদ্র-অভিযানের দুর্নিবার নেশা চাপলো ইয়োরোপীয়দের মনে। প্রথমদিকে ওঁদের প্রায় সকলেরই লক্ষ্য ছিলো 'সোনার ভারতবর্ষ'। শেষপর্যন্ত ভারতে পৌঁছোনোর দৌড়বাজিতে জিত হলো পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা'র। মোম্বাসা বন্দর থেকে স্থানীয় নাবিকদের সাহায্য নিয়ে তিনি গোয়ার উপকূলে এসে পৌঁছোলেন ১৪৯৮ সালে।

কলম্বাস ইয়োরোপের পশ্চিমে সাগর পাড়ি দিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন আমেরিকাকে, তেমনি দক্ষিণে আর এক মহাদেশের দেখা পাওয়া যাবে এই আশায় সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন ইংরেজ অভিযাত্রী জেম্‌স্‌ কুক। কুমেরু মহাদেশের বদলে তিনি গিয়ে পড়লেন কুমেরু সাগরের দ্বীপগুলোয়। তবু তিনিই যে প্রথম দক্ষিণের কুমেরুতে পৌঁছোতে পেরেছিলেন এমন কথা বোধহয় জোর দিয়ে বলা যায় না; তাঁর সময়ের বেশ কয়েকশো বছর আগে থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার সুদক্ষ নাবিকরা যে বহুবার অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দুই মেরু সাগরের দ্বীপগুলোতে পাড়ি জমিয়েছিলো তা বিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান

(১৪৮০-১৫২১)

নিজের দেশ পর্তুগালের অর্থ সাহায্য না নিয়ে স্পেনের অর্থে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলেন ম্যাগেলান। তিন বছর ধরে সাগর পাড়ি দিয়ে গোটা পৃথিবীকে চক্কর দিয়ে স্পেনে ফিরতে পেরেছিলো ম্যাগেলানের ২৮০ জন সঙ্গীর মাত্র ১৮ জন। ম্যাগেলান নিজে মারা পড়েন ফিলিপিন দ্বীপে।

জেমস্‌ কুক

(১৭২৮-১৭৭৯)

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে কুক আবিষ্কার করেন নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাভা, পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ। জেমস্‌ কুক মারা যান হাওয়াই-তে।

সমুদ্রে দিক নির্ণয়ের জন্য 'কম্পাস' কে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, আমাদের তা জানা নেই। পণ্ডিতদের মতে, চীনারাই সম্ভবতঃ এর আবিষ্কর্তা। প্রাচীন চীনা লেখক শেন্ কুয়ার বর্ণনা মতো, ১০৮৫ সালের আগেই চীনা নাবিকরা নৌ-যাত্রায় কাঁটা কম্পাসের ব্যবহার শুরু করেছিলো। ইয়োরোপীয়রা খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্পাসের ব্যবহার শুরু করে। প্রথম প্রথম অবশ্য নাবিকরা শুধুমাত্র একটা যন্ত্রের ভরসায় মাঝ সমুদ্রে চলাফেরা করতে রীতিমতা অস্বস্তি বোধ করতো। শুধু দিকনির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহারই নয়, যতই দিন যাচ্ছিলো, বিভিন্ন সমুদ্রের নিখুঁত মানচিত্র ততই আঁকা হচ্ছিলো এবং সেগুলি এসে পেঁছোচ্ছিলো দেশ বিদেশের নাবিকদের হাতে।

ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের মানচিত্রগুলিকে একসাথে বাঁধিয়ে ১৫৮৪ সালে বই হিসেবে প্রথম বের করেন 'লুকাস ওয়াখনার'; ডাচ্ ভাষায় লেখা এই বইটির নাম দিয়েছিলেন তিনি—'নাবিকের আয়না'। বইটাকে পরে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং সেই সময় ইয়োরোপীয় নাবিকদের কাছে এটা ছিল বেদ বাইবেলের মতো।

প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সমুদ্রকে ঘিরে মানুষের মনে যে হাজারো ভয় ছিলো আজ তা মিলিয়ে গেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে কৌতূহল মানুষের ফুরোয় নি। সাগরের বুকে নিত্যদিন চলেছে ভাঙাগড়ার খেলা। সমুদ্রের চেহারা পাল্টে চলেছে আজো; আর তাই বিশ্রাম নেই সমুদ্র অভিযাত্রীদের।

পাঁচ

সাগরতলের রূপরেখা
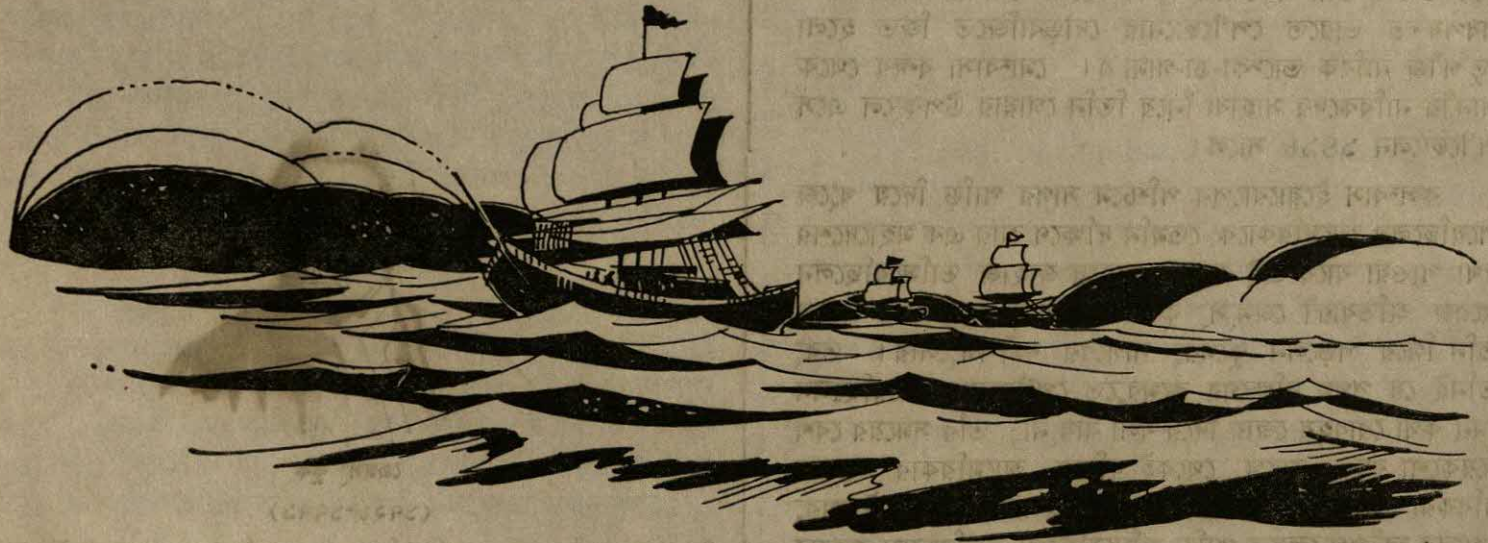
জাপানের দক্ষিণ উপকূলে সাগরপারে জেলেদের ছোট্ট একটা গ্রাম। 'উরাশিমা' নামে একটা ছোট্ট ছেলে বাস করতো জেলেদের সেই গাঁয়ে। ছোটবেলা থেকেই উরাশিমা বাবার সঙ্গে রোজ মাছ ধরতে যায় সমুদ্রে। প্রতি রাতে জোয়ারের সময় বাবা যখন সমুদ্রে নৌকো ভাসায়, উরাশিমা তখন নৌকোর গলুই-এ চুপচাপ বসে শোনে আশপাশের নৌকোয় জেলেদের কথা-বার্তা। তার কানে ভেসে আসে গাঁয়ের মেয়ে-বৌদের গান:

পড়ুক মস্তো মাছ তোমাদের জালে
হে ঈশ্বর, সবাই যেন ফেরে সকালে।......

উরাশিমা আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে ওঠে। সে আর গলুই-এ চুপচাপ বসে বাবার মাছধরা দেখে না, বরং বাবার মতোই নৌকোর হাল ধরে; মাঝ সমুদ্রে জাল ফেলে; রাশি রাশি মাছ ধরে। ভোরবেলা মাছগুলো ব্যাপারীরা নিয়ে গেলে হাতে যখন আর কাজ নেই, তখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, গল্প-গুজব আর সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে তার সময় কাটে।

তখনো উরাশিমার বয়স কুড়ি পেরোয় নি। নিজের জন্যে সে এরই মধ্যে বানিয়ে নিয়েছে একটা সাম্পান, অর্থাৎ মাছ ধরার ডিঙিনৌকো। তারপর থেকে সে একাই মাছ ধরতে বেরোয়। উরাশিমার বাবা-মাও ঠিক করে ফেলে, এবার ছেলের বিয়ে দেবে মিষ্টি কোনো মেয়ের সঙ্গে।
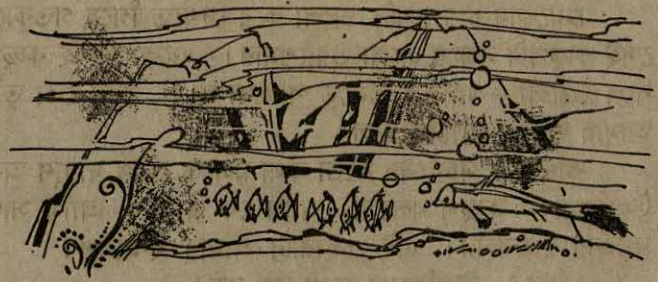
এরপর বাড়ীতে যখন ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়েছে, সেইসময় একদিন উরাশিমা সমুদ্রের পাড়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখলো, একটা বড়োসড়ো কচ্ছপ বালির উপর চিৎ হয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে কিন্তু কিছুতেই আর সোজা হতে পারছে না। কচ্ছপটাকে ঐ অবস্থায় দেখে উরাশিমার মনে ভারি কষ্ট হলো।

কচ্ছপটাকে দুহাতে তুলে জলের কাছাকাছি সোজা করে বালির উপর বসিয়ে দিয়ে বললো,—আহারে, তোর তো বয়স মোটেই বেশী নয়; যা, সমুদ্রে গিয়ে হাজার বছর বেঁচে থাক্।

উরাশিমার মনে হলো, জলে নেমে পড়ার আগে কচ্ছপটা যেন তার দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো।

পরের দিন সকালবেলায় উরাশিমা তার সাম্পান নিয়ে মাঝ-সমুদ্রে গেলো মাছ ধরতে। চারপাশ শান্ত, জলে একটুও ঢেউ নেই। জলে জাল ফেলে নৌকোর খোলের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে উরাশিমা। তখন সবে একটু ঝিমুনির মতো এসেছে, অমনি তার মনে হলো কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। উরাশিমা দারুণ অবাক্, কোথাও কেউ নেই। যতদূর চোখ

যায়, শুধু জল আর জল। আর অনেক দূরে বরফের মুকুট পরে 'ফুজি' পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

নৌকোর চারপাশটা ভালো করে দেখতে গিয়ে গতকালের সেই কচ্ছপটা নজরে এলো উরাশিমার। ওকে দেখেই কচ্ছপটা বলে উঠলো,—আমাকে চিনতে পারছো না? কাল তো তুমিই আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে।

কচ্ছপকে মানুষের মতো কথা বলতে দেখে দারুণ অবাক উরাশিমা। কচ্ছপ বললো,—আমি কে জান? আমি সাগর-রাজ্যের রাজকন্যা। এই চেহারাটা আমার ছদ্মবেশ।

সত্যি?—উরাশিমার চোখ বড় বড়।

হ্যাঁ, গো।—কচ্ছপটা উরাশিমার নৌকোর গায়ে সাঁতরে এগিয়ে আসে ঃ আসলে ব্যাপারটা কি জান, কচ্ছপের ছদ্মবেশ নিয়ে আমি আমার বর খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। আমার আসল রূপ দেখে তো কতজনই বিয়ে করতে চাইতো আমায়, কিন্তু তাতে তো আমি জানতে পারতাম না, আমার বরের মনটা সত্যিই ভালো কি না। কিন্তু কাল যেই সমুদ্রের পাড়ে এসেছি অমনি তোমাদের গাঁয়ের কটা ছেলে আমায় ধরে বালির উপর উল্টে ফেলে দিলো। তারা যখন আমায় কেটে খাবে বলে ছুরি আনতে গেলো তখন তুমিই তো এসে আমায় প্রাণ বাঁচালে; বললে, "তুই হাজার বছর বেঁচে থাক্"।

উরাশিমা কখনো কোনও রাজকন্যার সাথে কথা বলে নি। তার উপর রাজকন্যা তার মতো নগণ্য জেলের ছেলের এতো প্রশংসা করছে, বেশ লজ্জা পেয়ে উরাশিমা চুপ করে রইলো। কচ্ছপ-বেশী রাজকন্যা বললো,—তুমি আমার পিঠে চেপে বসো। আমি তোমাকে জলের তলায় সাগর-রাজার প্রাসাদে নিয়ে যাবো।

রাজপুরীতে যাবার জন্য উরাশিমা তো এক পায়ে খাড়া! কচ্ছপের কথামতো তার শক্ত খোলার উপর চেপে বসতেই—কচ্ছপটা তীরবেগে জলের ভেতর তলিয়ে গেলো। তারপর জলের তলায় গুহা, আর ছোট ছোট টিলা পেরিয়ে এক সময় পেঁছলো এক বিশাল রাজপুরীতে। দরজা দিয়ে রাজ-প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে উরাশিমাকে একটা বিরাট চত্বরে নামিয়ে দিয়েই কচ্ছপটা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

উরাশিমা দেখলো, চারপাশে নানা ধরনের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, জলের ভেতরে উরাশিমার শ্বাসকষ্ট কিংবা অন্য কোনও অস্বস্তি হচ্ছিলো না!

ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখতে গিয়ে হঠাৎ উরাশিমার নজরে এলো—অনেকগুলি সোনালী মাছের মাঝে ঝলমলে কিমোনো পরে দাড়িয়ে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। এটাই যে রাজকন্যার আসল রূপ তা বুঝতে কষ্ট হলো না উরাশিমার।

রাজকন্যা এসে উরাশিমার হাত ধরলো, বললো,—চলো আমার বাবার কাছে। বাবাকে গিয়ে বলবো, এই দেখো, আমার বর পছন্দ করে এনেছি।.........

শুধু জাপানেই নয়, সাগরের তলায় অজানা দেশ আর তার কল্পিত বাসিন্দাদের ঘিরে এমন সব রূপকথা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বহু দেশেই। সাগরতলের চেহারা নিয়ে আদ্যিকালের মানুষের কল্পনা যে পুরোটাই অলীক নয় সে কথা এখন জেনেছেন বিজ্ঞানীরা। পুরাণের সেই অগস্ত্য মুনির মতো কেউ যদি এখন এসে সাগরগুলোর জল শুষে নেয়—তবে যে ৩৬ কোটি কিলোমিটার চওড়া সমুদ্রতল আমরা দেখবো, তার সঙ্গে আমাদের চেনা মাটি-পাথরের পৃথিবীর তেমন কোনও অমিল নেই। ভূপৃষ্ঠে যেমনটি দেখা যায়, ঠিক তেমনি সাগরের তলাতেও আছে সমতলভূমি, শৈলশিরা, পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি আর খরস্রোতা নদী। তফাৎ শুধু একটাই; ভূ-পৃষ্ঠের পাহাড়-পর্বতের মতো সমুদ্রতল পাললিক শিলা দিয়ে তৈরী নয়, তার বদলে তৈরী অপেক্ষাকৃত ভারী ব্যাসাল্ট পাথর দিয়ে।

সত্যি বললে, পৃথিবীর উপর আমাদের চেনা পাহাড়-

পর্বত, গুহা-বন্দর—বিশালত্বের দিক থেকে কোনও কিছুই সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে থাকা পর্বত বা আগ্নেয়গিরির ধারে-কাছে আসে না। যেমন, 'আন্দিজ'কে বলা হয় পৃথিবীর সব-চেয়ে বড়ো পর্বতমালা। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর কোণের ক্যারিবিয়ান সাগরের তীর থেকে শুরু করে দক্ষিণে হর্ণ-অন্তরীপ—গোটা মহাদেশ জুড়েই এর বিস্তৃতি। অথচ আন্দিজের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ লম্বা শৈলশিরা ডুবে রয়েছে অতলান্তিক মহাসাগরের মাঝ-বরাবর—যার নাম মিড্ অ্যাট-লান্টিক রিজ্। এই পর্বতমালা ছড়িয়ে রয়েছে আইসল্যান্ড থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত; দেখতে অনেকটা ইংরাজী 'S' অক্ষরের মতো, লম্বায় নিদেন পক্ষে ১৬ হাজার কিলোমিটারের বেশী বইতো কম নয়।

অতলান্তিকের কোনও কোনও জায়গায় এই শৈলশিরা মাথা উঁচু করে দ্বীপের চেহারা নিয়েছে, তবে এর অধিকাংশ চূড়া আজও রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোথাও ৫০০ মিটার, কোথাও বা ১,৫০০ মিটার নীচে। সাধারণভাবে এই পর্বত-মালার উচ্চতা ১,৫০০ থেকে ৩,০০০ মিটারের মধ্যে ওঠানামা করে। এর সবচেয়ে উঁচু চূড়া হলো 'পিকো' নামে পর্তুগালের একটা ছোট্ট দ্বীপ—যা সমুদ্রতল থেকে ৯,০০০ মিটার উঁচু; জলের উপর এর যে অংশটা জেগে রয়েছে তারই উচ্চতা ২,৫০০ মিটার।

অতলান্তিকের তলায় এই শৈলশিরা যে জল অপসারণ করেছে তার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি ঘন-কিলোমিটার। তার মানে, শৈলশিরাটা না থাকলে পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্রের জল থাকতো এখনকার তুলনায় ৪২ মিটার নীচে!

অতলান্তিকের তলায় এই পর্বতমালার পশ্চিম দিকের ঢাল এবং তলার দিকের ঢিবিগুলির উপর জমে থাকা পলিমাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোথাও কোথাও তা ৪,০০০ মিটার অবধি পুরু। বিজ্ঞানীদের ধারণা—জলের তলায় ডুবে থাকা শৈলশিরার গায়ে এই পলি জমতে সময় লেগেছে নিদেনপক্ষে কয়েককোটি বছর। খুব সম্ভবতঃ এইসব পাহাড়গুলির জন্ম হয় এখন থেকে ৬০ কোটি বছর আগে—প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে।

অতলান্তিকের মতো প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগরের নীচেও পর্বতমালার খোঁজ মিলেছে, যদিও আকারে সেগুলি ছোট। প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় পর্বতমালার চূড়াগুলি অনেক জায়গায় ছোট-বড়ো দ্বীপ হিসেবে জলের উপর জেগে উঠেছে; হাওয়াই হলো তেমনি এক দ্বীপপুঞ্জ। সমুদ্রের তলায় এযাবৎ যে সব পর্বতমালার সন্ধান মিলেছে তাদের মোট দৈর্ঘ্য নিদেনপক্ষে ৬০ হাজার কিলোমিটার এবং চওড়ায় এগুলি গড়ে ১,৩০০ কিলোমিটার।

পৃথিবীর মাটির উপর যেসব আগ্নেয়গিরির সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের তুলনায় ঢের বেশী সংখ্যায় আগ্নেয়-গিরি রয়েছে জলের তলায়। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু আগ্নেয় গিরির নাম 'মউনা-কি'; হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এই আগ্নেয়গিরির চূড়ো রয়েছে জল থেকে ৪২৬৭ মিটার উপরে, আর জলের তলায় এর যে অংশটা রয়েছে তার উচ্চতা ৪৮৭৭ মিটার। তাহলে উপর-নিচে মিলিয়ে সবশুদ্ধ মউনা-কি'র উচ্চতা দাড়ালো প্রায় ৯১৪৪ মিটার—পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ এভারেষ্টও হার মানছে এর কাছে।

সমুদ্রের তলায় ডুবে থাকা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা কম না; এইসব আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙলে এদের জ্বালামুখ থেকে ছাই আর গলন্ত লাভা ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের মেঝেয়; জলের ভেতর যে আলোড়ন চলতে থাকে বাইরে থেকে তা বোঝা না গেলেও আগ্নেয়গিরির আগুনের তাপে সাগরের জল টগবগ করে ফুটতে থাকে এবং অল্পসময়ের মধ্যে বাষ্প হয়ে মেঘের আকারে ঘিরে ফেলে সমুদ্রের ঐ অঞ্চলকে।

জলের তলায় আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার ফলে নতুন দ্বীপের জন্ম হওয়াটাও বিচিত্র নয়। কখনও সখনও এইসব

দ্বীপ আবার আস্তে আস্তে মানুষের বসবাসের উপযোগীও হয়ে ওঠে, কখনও বা জন্মের অল্পদিন পরেই আবার তলিয়ে যায় জলের তলায়—যেমনটা ঘটেছে 'মায়োজীন'-এর ক্ষেত্রে। জাপানের টোকিও থেকে শ'চারেক কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের তলায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎগারের ফলে, ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে তিন-তিনবার 'মায়োজীন' দ্বীপের জন্ম হয়, এবং বিস্ফোরণে তা আবার ধ্বংস হয়ে তলিয়ে যায় সাগরের তলায়।

সাগর-মহাসাগরের তলায় এই যে সব প্রকাণ্ড পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি কিংবা অতলান্ত গহ্বর—এদের খোঁজ মিলেছে একেবারেই হাল আমলে। আগেকার দিনে সমুদ্রের গভীরতা মাপতে জাহাজ থেকে দড়ি কিংবা তারের মুখে পাথর বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হতো জলে। সাধারণতঃ অতলান্তিক-উপকূলের মানুষরাই এভাবে সমুদ্রের গভীরতা মাপার চেষ্টা করতো। যেহেতু মহাসাগরগুলির মধ্যে অতলান্তিক হলো সবচেয়ে অগভীর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই দড়ি বা তারে বাঁধা সীসের তাল জলের নীচে শ'খানেক বা
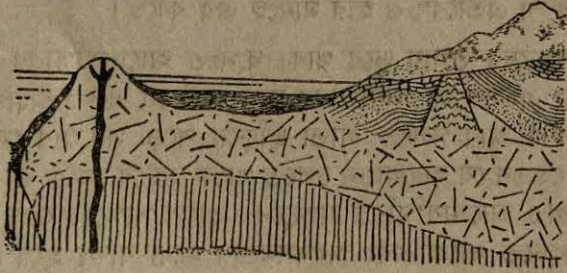
সমুদ্রের মাঝে আগ্নেয়গিরির চূড়াগুলো সময়ে সময়ে জলের উপর উঠে এসে দ্বীপের চেহারা নেয়। মহাদেশ এবং সমুদ্রের নীচে গ্রানাইট পাথরের স্তর দেখতে পাওয়া যায়।

শ'দুয়েক ফ্যাদম যাওয়ার পরই সাগরের মেঝেয় গিয়ে ঠেকতো। এক ফ্যাদম আসলে ২ গজ বা ১৮৩ সেন্টিমিটারের সমান; কেন যে নাবিকেরা গজ-ফুটের হিসেব ছেড়ে সমুদ্রের গভীরতা ফ্যাদম-এ মাপতে শুরু করেছিলো, তা অবশ্য আমরা কেউই জানি নে।

•

প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত জলে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে স্পেনের নৌবহর। জাহাজগুলো যখন 'সেন্ট পল' আর 'লস্ টিবুরোন্‌স্' নামের দুটো প্রবালদ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলেছে, নৌবহরের অধিনায়ক ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান জলের গভীরতা মাপার জন্য হুকুম দিলেন নাবিকদের। দড়ি-বাঁধা সীসের চাঁই নামানো হলো জলে। সীসের চাঁই জলের তলায় নামছে তো নামছেই—সমুদ্রের তল আর পায় না। সড়সড় করে জলের তলায় ২০০ ফ্যাদম নেমে যাওয়ার পরই দড়ি খতম!

ম্যাগেলান চিৎকার করে বললেন,—সমুদ্রের গভীরতম অংশের উপরে আমরা রয়েছি।

এর প্রায় ৩২০ বছর পর ১৮৩৯ সালের তেসরা জানুয়ারী জেম্‌স্ ক্লার্ক রস এসে পৌঁছলেন দক্ষিণ মেরু সাগরে। ওখানেই সমুদ্রের গভীরতা মাপলেন তিনি। রস-এর হিসেবমতো জায়গাটা ছিলো ২৪২৫ ফ্যাদম বা ৪৩০০ মিটার গভীরে।

পরবর্তীকালের অভিযানে সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলগুলির সন্ধান মিলেছিলো। ১৮৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক নাবিক প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা-পরিখায় খুঁজে পেলেন ৯,৬৪০ মিটার গভীর এক জায়গা।

ইকো-সাউণ্ডারের সাহায্যে শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপার চেষ্টা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। যেহেতু জলের মধ্যে একমাত্র শব্দতরঙ্গেরই রয়েছে অবাধ গতি—জাহাজের নীচে আটকে রাখা ইকো-

সাউন্ডার যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গ পাঠিয়ে এবং তার প্রতিধ্বনি সাগরতলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে যে সময় নেয় তা মাপজোখ করে সমুদ্রের গভীরতা নিখুঁতভাবে বের করা সম্ভব। বস্তুতঃ সাগর-মহাসাগরের তলায় আগ্নেয়গিরি, পর্বত-মালা, সমতলভূমি আর গিরিখাতগুলিকে চিনিয়ে দেওয়ার যাবতীয় কৃতিত্ব ঐ ছোট্ট যন্ত্রটার।

এ ব্যাপারে সঠিক ছবিটা পাওয়া গেছে ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে। একটাই পর্বতমালা যে সমস্ত মহাসাগর-গুলির তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে—আলট্রাসনিক ইকোসাউন্ডার না থাকলে সে খবরটা হয়তো আজো আমাদের কাছে অজানাই থেকে যেত। আবার ঐ পর্বতমালার গায়ে হাজার হাজার কিলোমিটার লম্বা ফাটলেরও সন্ধান দিয়েছে ঐ যন্ত্রটাই। ফাটলগুলি চওড়ায় ১৩ থেকে ৫০ কিলো-মিটার এবং কোথাও কোথাও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর! ১৯৬০ এর দশকে ডুবন্ত পাহাড়ের মাথায় ঐ ফাটলগুলির খোঁজ পাওয়ার পরই ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির রহস্য উদ্ধার হয়েছে।

পৃথিবীর কেন্দ্রে এখনও যে বিপুল তাপ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তারই চাপে গলন্ত পাথর পাহাড় চূড়ার ফাটলগুলি দিয়ে বেরিয়ে আসে; তারপর তা পাহাড়গুলির গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের মেঝেয়। ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে 'গ্লোমার চ্যালেঞ্জার' নামে এক গবেষণা জাহাজ বিভিন্ন সমুদ্রের মেঝে খুঁড়ে যে পাথর তুলে আনে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে—ডুবন্ত পর্বতমালার আশেপাশের পাথর বয়সে যথেষ্ট নবীন; পাহাড়গুলি থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই পুরনো যুগের পাথরের হদিশ মেলে।

সাগরের নীচে বিস্তীর্ণ পরিখাগুলির সন্ধান মিলেছে প্রধানতঃ আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্প-প্রবণ জায়গাগুলির

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জিব্রাল্টার প্রণালীতে দুরকম স্রোতকে কাজে লাগিয়ে দুদিকেই যাতায়াত করতো জার্মান সাবমেরিনগুলি। দ্রুত বাষ্পযানের ফলে ভূমধ্যসাগরের জলে নুনের ভাগ বেশি। অতলান্তিকের অপেক্ষাকৃত হাল্কা জল, যাতে নুনের ভাগ কম, তা ভারী জলের নীচ দিয়ে বয়ে চলে।

আশপাশে। এদের গভীরতা ৬ থেকে ১১ কিলোমিটারের মধ্যে এবং তলাটা ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার চওড়া। কেউ কেউ বলেন, সমুদ্রের মেঝেয় জমে থাকা পুরনো যুগের পাথর ঐ পরিখার মধ্যে দিয়েই ভূত্বকের শেষ সীমায় পৌঁছয়।

গভীর সমুদ্র এলাকায় এযাবৎ ২৩টি পরিখার সন্ধান মিলেছে, যাদের মধ্যে ১৮টাই রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। 'টোঙ্গা-কারমাডেক', 'কুরিল কামচাটকা', 'ফিলিপাইন', 'মারিয়ানা' ইত্যাদি নামের এইসব পরিখাগুলির ভেতরে আমাদের চেনাজানা তাবড় তাবড় পর্বতমালা সেঁধিয়ে যেতে পারে। এদের মধ্যে 'মারিয়ানা' পরিখার গভীরতা সবচেয়ে বেশী। পৃথিবীর গভীরতম অঞ্চলটি, যার গভীরতা ১১,০৩৪ মিটার, খুঁজে পাওয়া গেছে এই পরিখাতেই। এভারেস্ট

পর্বতকে যদি ঐ অঞ্চলে এনে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও তার চূড়াটা থাকবে জলের প্রায় দু'কিলোমিটার নীচে!

ভৌগোলিক দিক থেকে সাগর-মহাসাগরকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটা হলো কণ্টিনেণ্টাল সেল্‌ফ্‌ বা মহাদেশীয় সোপান—পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় উপকূল অঞ্চল ঘিরে রয়েছে যা। সমুদ্র এখানে একেবারেই অগভীর এবং সমুদ্রের তলাটাও মোটামুটি মসৃণ। উপকূল থেকে সমুদ্রের বহুদূর পর্যন্ত নেমে গেলেও সমুদ্রের গভীরতা গিয়ে দাঁড়ায় একশো-দেড়শো মিটারে। মহাদেশের নদীগুলি সমুদ্রের বুকে ক্রমাগতঃ যে পলি এনে জমা করে, তারই ফলে মহাদেশীয় সোপানের জন্ম হয়েছে। সমুদ্রের অংশ হলেও ডাঙ্গাজমির সাথে এর দারুণ মিল। সূর্যের আলো পেঁছয় বলে শতকরা ৯০ ভাগ সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর প্রাণীর ভীড় এখানে।

শুধু তাই না, মহাদেশীয় সোপানগুলির তলায় পাললিক শিলার স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা, গন্ধক ইত্যাদির বিপুল ভাণ্ডার। ইতিমধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছে মিলেছে টিনের খনি; তেল মিলেছে ক্যাস্পিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, আরব সাগরে। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী—গোটা মহাদেশীয় সোপানের নীচে নাকি সঞ্চিত রয়েছে ৪,০০০ কোটি টন তেল!

মহাদেশীয় সোপানের শেষ যেখানে, সেখান থেকে শুরু হয় 'মহাদেশীয় ঢাল'; সমুদ্রতল এই ঢাল ধরে খাড়াই নেমে যায় বেশ কয়েক কিলোমিটার গভীরে। সমুদ্রকে যদি একটা পুকুর হিসেবে কল্পনা করা যায় তবে মহাদেশীয় ঢাল হলো তার চারপাশের দেওয়াল; বস্তুতঃ গভীর সমুদ্রের শুরু এখান থেকেই। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেই স্থলভূমির চিহ্নগুলো মুছে যেতে শুরু করে; গাছপালা দেখা যায় না, বালির বদলে দেখতে পাওয়া যায় ধূসর, সবুজ কিংবা নীল রঙের কাদা। সত্যি বললে, এই মহাদেশীয় ঢালগুলিই সমুদ্র থেকে মহাদেশগুলিকে আলাদা করে রেখেছে॥ এই ঢালগুলির গড়-উচ্চতা তিন-চার হাজার মিটার হলেও, কোনও কোনও জায়গায় তা ন'-দশ হাজার মিটারও খাড়াই নেমে গেছে!

বিস্তীর্ণ পরিখার সন্ধান মিলেছে মহাদেশীয় ঢালগুলিতে। যতদূর মনে হয়, তুষার যুগে সমুদ্রের জল যখন অনেকটা নীচে নেমে গেছিলো তখন এইসব মহাদেশীয় ঢালগুলো উঠে এসেছিলো জলের উপরে; সেই ঢালের উপর দিয়ে বয়ে যেত খরস্রোতা সব নদী। তুষার যুগ শেষ হলে উত্তর-গোলার্ধের বরফ গললো, সমুদ্রে জল বাড়লো, মহাদেশীয় ঢালগুলো ক্রমশঃ তলিয়ে গেলো জলের তলায়। ঢালের উপর আগেকার নদীখাতগুলিকেই আমরা আজ গভীর পরিখা হিসেবে দেখতে পাই। অবশ্য ভূমিকম্পের ফলেও মহাদেশীয় ঢালের গায়ে ফাটল ধরা একেবারে অসম্ভব নয়।

মহাদেশীয় ঢাল ধরে সোজা নেমে গেলেই পেঁছে যাওয়া যায় সমুদ্রের গর্ভদেশে—এটাই হলো সমুদ্রের গভীরতম অংশ এবং এর আয়তন সমুদ্রের মোট আয়তনের সাত ভাগের পাঁচ ভাগ। সেদিক থেকে দেখলে, পৃথিবী পৃষ্ঠের অর্ধেকই রয়েছে গভীর সমুদ্রের দখলে। এখন থেকে বছর চল্লিশ আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল—মহাসাগরগুলির মেঝে মোটামুটি মসৃণ; অতলান্তিকের তলায় ডুবে থাকা পর্বতমালা কিংবা ফিলিপাইনের আশপাশে জলের তলার পরিখাগুলি নেহাতই ব্যতিক্রম। ১৯৪৭ সালে সুইডিশ জাহাজ 'আলবাট্রস' বেরলো গভীর সমুদ্র অভিযানে। পনেরো মাস ধরে গোটা পৃথিবীর যাবতীয় সাগর-মহাসাগরে চক্কর দিয়ে ফিরে আসার পর যে তথ্য মিললো, তাতে বলতে গেলে বিজ্ঞানীদের পুরনো ধারণাগুলির সবই বাতিল হয়ে গেলো। আলবাট্রস

দিলো জলের তলায় অসংখ্য শৈলশিরা আর আগ্নেয়গিরির সন্ধান। বস্তুতঃ জাহাজটার ইকোসাউন্ডার জলের তলায় কয়েক কিলোমিটারের বেশী বিস্তৃত সমভূমির খোঁজ পায় নি। জলের তলায় যেখানে পাহাড় পর্বত বা পরিখা নেই সেখানেও সাগরের মেঝে মসৃণ তো নয়ই, বরং রীতিমত উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পূর্বে ভারত-মহাসাগরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেখানে বেশ কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গাজুড়ে মসৃণ সমতলের সন্ধান পেয়েছিলো আলবাট্রস। জাহাজের যন্ত্রপাতি নামানো হয়েছিলো জলের তলায়—সাগরের মেঝে থেকে যদি খানিকটা নমুনা মাটি-পাথর তুলে আনা যায় এই আশায়। ভারত মহাসাগরের ঐ অঞ্চলের মেঝে আগ্নেয়গিরির শক্ত লাভা দিয়ে তৈরী বলে তার নমুনা জলের উপর তুলে আনা সম্ভব হয় নি। অতলান্তিকেরও তলায় বারমুডা দ্বীপ থেকে মধ্য অতলান্তিক শৈলশিরা পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এজাতীয় সমভূমির সন্ধান মিলেছে; এখানে অবশ্য জায়গায় জায়গায় রয়েছে ছোট ছোট টিলা—সম্ভবতঃ এদেরও জন্ম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকেই।

শঙ্কু আকৃতির উঁচু আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর মহাদেশগুলোয় কচিৎ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়, অথচ প্রায় সব সমুদ্রের তলাতেই শ'য়ে শ'য়ে দেখা মেলে এদের। এদের অল্প কয়েকটা জলের উপর মাথা তুলে আছে; অধিকাংশই অবশ্য ডুবে রয়েছে জলের তলায়—সূর্যের আলোর মুখ দেখার সুযোগ এদের কোনকালে হয় না। জলের উপর একসময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো অথচ পরে আবার জলের তলায় চলে গেছে এমন আগ্নেয়গিরির সংখ্যাও প্রচুর।

ছয়

নীলসাগরের দ্বীপ

পৃথিবীর মানচিত্রটাকে সামনে ধরলে সুনীল মহাসাগরের বুকে দেখা যায় কালির অসংখ্য ফুটকি; ওগুলো মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট বড় সব দ্বীপ। ওদের কারোর বয়স কোটি কোটি বছর, কারোর বা জন্ম হলো এই সেদিন! সমুদ্রে লুকিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরির খেয়ালখুশীতেই দ্বীপগুলির জন্ম; আবার, অনেক অনেক দ্বীপ যে হঠাৎ হঠাৎ জলের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেও ঐ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণেই।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে উত্তর আমেরিকার কোল ঘেঁষে অতলান্তিকের তলায় এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরির হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে গেলো। সাগরের শান্ত জলে সেদিন সে কী তোলপাড়! আগ্নেয়গিরির তাপে জল ফুটতে লাগলো টগবগ করে আর সেই ফুটন্ত জলের ভেতর থেকে ছিটকে বেরোতে থাকলো লাভা আর ছাই। লাভার স্তর জমে জমে তৈরী হলো পাহাড়। জল ছাপিয়ে সেই পাহাড়ের চুড়ো ক্রমেই উঁচু হলো, শেষমেশ জলের ঠিক উপরে পাহাড়ের তলদেশের আয়তন দাঁড়ালো প্রায় ৫০০ বর্গকিলোমিটার।

তারপর হাজার হাজার বছর ধরে ঢেউ-এর আঘাতে পাহাড় চুড়া ক্ষয়ে ক্ষয়ে পরিণত হলো চড়ায়। জলের উপর সেই চড়া-ই আজকের বারমুডা দ্বীপ। মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সব দ্বীপ আজ সাগর-মহাসাগরের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাদের প্রায় সবগুলোরই জন্মের ইতিহাস অনেকটা এরকমই।

দেখা গেছে, সমুদ্রগর্ভে যেখানে দ্বীপের জন্ম হয় সেখানকার ভূত্বক কোথাও ৬০-৭০ কিলোমিটারের বেশী পুরু নয়—বিশাল এই পৃথিবীর গায়ে তা যেন এক পাতলা চাদর। ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে সে আবরণ জায়গায় জায়গায় আবার কুঁচকেও যায়, আর ভূ-ত্বকটা যথেষ্ট পুরু নয় বলেই কোঁচকানো জায়গাগুলোয় ধরে ফাটল। মাটির ভেতরকার সঞ্চিত লাভা, গলন্ত পাথর, ছাই আর গ্যাস সেই ফাটল ধরে বেরিয়ে আসতে থাকে।

তবে তিন-চার কিলোমিটার পুরু জলস্তরের প্রচণ্ড চাপের জন্যে, আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙলেই তা রুদ্ররূপ ধরতে পারে না। লাভার স্তর একের পর এক জমতে জমতে আগ্নেয়-পাহাড়ের জন্ম হয়। সেই আগ্নেয়-পাহাড় উঁচু হতে হতে জলের উপর যেই মাথাচাড়া দিতে যায় অমনি নরম ছাই-পাথর দিয়ে তৈরী পাহাড়ের সে চুড়া সমুদ্রের ঢেউ-এর বিষম ঝাপটায় আবার ডুব দেয় জলে। এই ঘটনাটাই ঘটতে থাকে বারে বারে। ঢেউ-এর চাপড় খেয়ে খেয়ে পাহাড়ের আগাটা হয় মসৃণ; জলের সামান্য তলায় চড়ার আকারে বছরের পর বছর পড়ে থাকে তা—ঢেউ-এর কড়া শাসানীকে উপেক্ষা করে কিছুতেই বেচারী আর মাথা তুলতে পারে না!

শেষে একদিন সেই আগ্নেয় পাহাড়ের ভেতরটা কেঁপে ওঠে; ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি নতুন করে জেগে উঠে লাভা উগরোতে থাকে। জমাট-বাঁধা লাভার স্তর এবার মাথা তোলে জলের উপর, সাগরের ঢেউকে আর পরোয়া না করেই। জন্ম হয় নতুন দ্বীপের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় ২০০টি জলমগ্ন পর্বতশ্রেণীর সন্ধান মিলেছিলো। সমুদ্রের তলা থেকে খাড়াই উঠে যাওয়া এইসব পাহাড়ের চূড়াগুলো ভোঁতা; সম্ভবতঃ পাহাড়গুলোর সবকটাই হলো আগ্নেয়-গিরি, যাদের জ্বালামুখগুলো কোন একসময় পলিতে বুজে গেছে। সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আগে এগুলি ছিলো নিঃসঙ্গ সব দ্বীপ! কেন যে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেলো এরা, সমুদ্রে জল বাড়ার জন্য, নাকি পাহাড়গুলির তলদেশ বসে গেছে বলে—তার উত্তর কারোও এখনও সঠিকভাবে জানা নেই। এইসব জলমগ্ন আগ্নেয়গিরি আবার কবে জলের উপর মাথা তুলবে, কবে আবার নতুন দ্বীপের জন্ম হবে তাও আমাদের বর্তমান জ্ঞানের বাইরে।

সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরিরা যে মোটেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে না তার প্রমাণ, আগ্নেয়গিরিসঙ্কুল এলাকায় হঠাৎ বিক্ষুব্ধ ঢেউ-এর পাল্লায় পড়ে বহু জাহাজের নাবিকরা নাজে-হাল হয় আজো। ঐসব এলাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাষ্প উঠতে দেখা যায়; মনে হয়, কড়াইতে চাপানো জল বুঝি ফুটতে শুরু করেছে! অনেক জায়গায় আবার দেখা যায় সমুদ্রের উপর জলের ফোয়ারা উঠতে। তাছাড়া সমুদ্রের ঐ অঞ্চলে আগ্নেয়-ছাই আর ঝামা-পাথরের সঙ্গে গভীর জলের মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদেরও মরা অবস্থায় ভেসে যেতে দেখা যায়। আগ্নেয়গিরি থেকে জন্ম নবীন দ্বীপগুলোর মধ্যে 'অ্যাসেনসিয়ন'-এর অবস্থান আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে অতলান্তিক মহাসাগরের যে অংশ, তার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। আধপোড়া ছাই-এ ঢাকা গোটা দ্বীপটায় অন্ততঃ ৪০টা মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ রয়েছে। অথচ এর ঢালু অঞ্চলে বড় বড় গাছের ফসিল পাওয়া গেছে। একসময় ঐ দ্বীপে যে ঘন জঙ্গল ছিলো, এটা তারই প্রমাণ। কি করে যে সেইসব গাছপালা নিশ্চিহ্ন হলো, তা কেউ জানে না। আজ 'গ্রীন মাউণ্টেন' নামে ওখানকার সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ ছাড়া আর কোথাও কোন সবুজের চিহ্নমাত্র নেই!

'অ্যাসেনসিয়ন'-এর মতো অতবড়ো না হলেও—ইদানীং-কালেও সাগর-মহাসাগরে ছোটবড়ো দ্বীপকে জন্ম নিতে দেখা গেছে; আবার হয়তা কয়েকমাস বা কয়েকবছর পর সমুদ্রের বুকে এদের অনেককেই বিলীন হয়ে যেতেও দেখা গেছে।

জাপানের উপকূলের কাছে 'মায়োজীন' যেমন মাত্র এক-বছরের মধ্যে তিন-তিনবার আত্মপ্রকাশ করে প্রত্যেকবারই আবার হারিয়ে গেছে জলের তলায়—তেমনি অস্ট্রেলিয়ার উপ-কূল থেকে হাজার তিনেক কিলোমিটার পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে 'ফ্যালকন্' নামে ছোট্ট একটা দ্বীপ ১৯১৩ সালে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। ১৩ বছর পরে ঐ এলাকায় প্রচণ্ড আগ্নেয় বিস্ফোরণের ফলে দ্বীপটি আবার জলের উপর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু ১৯৪৯ সালের পর দ্বীপটার আর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

১৮৩০ সালে ইতালীর সিসিলি আর আফ্রিকার উপ-কূলের মাঝখানে ভূমধ্যসাগরে প্রায় ২০০ মিটার জলের তলায় ডুবে থাকা এক আগ্নেয়গিরি হঠাৎ একদিন জেগে উঠলো। জলের উপর আধপোড়া কালো ছাই-এর ঢিবিটার উচ্চতা দাঁড়ালো প্রায় ৬০ মিটার। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য ঝড়-বৃষ্টি আর সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে ধ্বসে পড়লো সেই ছাই-এর স্তূপ। 'গ্রাহাম্‌স্ রীফ' নামে ওটা এখন একটা ছোটখাট চড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

আকস্মিক বিস্ফোরণেও সময়ে সময়ে আগ্নেয়গিরিজাত দ্বীপগুলির মৃত্যু ঘটে। জাভা ও সুমাত্রার মাঝখানে সুন্দা প্রণালীতে জেগে থাকা ছোট্ট শান্ত দ্বীপ ক্রাকাতোয়া। ১৬৮০

দ্বীপের জন্মমুহূর্তে......

সালে এখানে একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটেছিলো। দু'শো বছর পর ওখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হতে থাকে। ১৮৮৩ সালে ক্রাকাতোয়া দ্বীপের আগ্নেয়গিরির মাথায় যে ফাটলের সৃষ্টি হয় তা থেকে ধোঁয়া আর বাষ্প বেরোতে থাকে। ঐ বছরেরই ২৭শে আগস্ট ক্রাকাতোয়া দ্বীপটা এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে যায়। অবিরাম অগ্ন্যুৎপাত চলতে থাকে দু'দিন ধরে; চারদিকে শুধু উত্তপ্ত লাভা, জলন্ত পাথর, মিশমিশে কালো ধোঁয়ার তাণ্ডব নৃত্য। তারপর সব শান্ত হলো। তখন দেখা গেলো, যে দ্বীপের চূড়োটা ছিলো জলের চেয়ে ৪০০ মিটার উঁচুতে, তা তলিয়ে গেছে জলের ৩০০ মিটার তলায়! কেবল আগেকার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখটার কিনারার সামান্য অংশ পুরনো দ্বীপের স্বাক্ষর বয়ে জেগে আছে জলের উপর।

মর্মন্তুদ এই প্রলয়ের মধ্যে দিয়েই ক্রাকাতোয়া বিশ্বখ্যাত হয়ে ওঠে। ঐ বিস্ফোরণে ঢেউ উঠেছিলো ৩০ মিটার উঁচুতে। সেই ঢেউ 'সুন্দা' প্রণালীর কাছে নিচের গ্রামগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; মারা পড়ে ৩৮,৩৮০ জন মানুষ আর লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশুপ্রাণী। প্রচণ্ড সেই ঢেউ ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বহু দেশের উপকূলে গিয়ে ধাক্কা দেয়; ঢেউ মারফৎ বিস্ফোরণের অস্তিত্ব অতলান্তিকের হর্ণ অন্তরীপ, এমনকি ইংলিশ চ্যানেলেও টের পাওয়া গেছিলো। বিস্ফোরণের আওয়াজ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার দূরে মাদাগাস্কার দ্বীপেও শোনা যায়। ক্রাকাতোয়াকে চুরমার করে আগ্নেয় ধূলো আর মিহি পাথরের মেঘ গোটা পৃথিবীর আকাশে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় একবছর ধরে প্রতিটি দেশ থেকে সূর্যাস্তের সময় আকাশে এক অদ্ভুত বর্ণচ্ছটা দেখা যেত!

১৮৮৩ সালে ক্রাকাতোয়ার বিস্ফোরণের সময় ঐ দ্বীপের যাবতীয় জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটেছিলোঃ প্রাণে বেঁচেছিলো একটি মাত্র বাঁদর। সুন্দা-প্রণালীর জলে ভেসে যাওয়ার সময় বাঁদরটিকে উদ্ধার করা হয়। প্রাণে বেঁচে গেলেও ওর সারা শরীর আগুনে একেবারে ঝলসে গিয়েছিলো। বিস্ফোরণের কিছুদিন পর একদল বিজ্ঞানী জলের উপর ভেসে থাকা ক্রাকাতোয়ার ছোট্ট অংশটায় যান, তন্নতন্ন করে খুঁজেও ক্ষুদে একটা মাকড়সা ছাড়া অন্য কোনও জীবিত প্রাণী বা গাছের সন্ধান পাননি ওঁরা। মাকড়সাটা অবশ্য ঐ প্রলয়ের মধ্যে বসেও বৃথাই তার জাল বুনে চলেছিলো!

পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে—যেখানে সূর্যকিরণের তেজ সবচেয়ে বেশী, সেখানকার সমুদ্রে এক বিশেষ ধরনের দ্বীপের

দেখা মেলে, যার উপরকার মাটি সরালেই বেরিয়ে পড়ে ক্যালসিয়ামের শক্ত জমাট স্তর। তার রং কখনো লাল কখনো বা সাদা। এরাই হলো প্রবালদ্বীপ। উদাহরণ হিসেবে আমাদের কাছাকাছি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আর লাক্ষাদ্বীপের নাম করা যায়। প্রবালদ্বীপের উৎপত্তি 'প্রবালকীট' নামে সামুদ্রিক প্রাণী থেকে। সমুদ্রের গভীরে লক্ষ-কোটি ক্ষুদে কীট একজোট হয়ে কি করে প্রবালদ্বীপ সৃষ্টি করে—বহুদিন যাবৎ তা রহস্যই থেকে গেছিলো সকলের কাছে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে সে রহস্য ভেদ করেন বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন।

প্রবালদ্বীপের শক্ত পাথুরে জমিটা যে কীটজাতীয় কোনও প্রাণীর খোলায় তৈরী—ডারউইন তা বুঝেছিলেন ১৮৩৭ সালেই। শামুকের মতো প্রবালকীটও যে শরীর থেকে রস বের করে নিজের চারপাশে শক্ত খোলা বানিয়ে নেয়—সেটা অবশ্য তখনই জানা ছিলো। কিন্তু জানা ছিলো না, কেমন করে প্রবালকীটের খোলা সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে জমতে জমতে উঠে আসে জলের উপর; কারণ এই ক্ষুদে প্রাণীগুলি আসলে সমুদ্রের উপরতলার বাসিন্দা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০-৫০ মিটার নীচে জল যেরকম ঠান্ডা তাতে প্রবালকীটের পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকাই মুশকিল।

ডারউইনের এসব দেখে ধারণা হলো, ডুবে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির উপর মৃত প্রবালকীটের খোলস জমে প্রবালদ্বীপের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ডারউইনের কথাগুলো যে আজগুবী নয় তার প্রমাণ মিললো শ'খানেক বছর পরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রবালদ্বীপ 'বিকিনী'-তে ড্রিল মেশিন বা খননযন্ত্র বসিয়ে দেখা গেল, প্রবালস্তর ওখানে প্রায় ৬০০ মিটার পুরু। ৮০০ মিটার খোঁড়ার পর আবার জল আর পলিমাটির সন্ধান মিললো; সন্ধান মিললো আগ্নেয়গিরির ভস্মের।

পরবর্তীকালে একই জিনিস দেখা গেছে অন্যান্য প্রবালদ্বীপের ক্ষেত্রেও। জলের তলায় ডুবে থাকা আগ্নেয়গিরি-ই যে

আগ্নেয়গিরির ঢালু অংশে, জলের নিচে প্রবালদের বাস। আগ্নেয়গিরির যখন জলের নিচে ডুবতে থাকে, প্রবালরাও মাথা চাড়া দিতে থাকে ধাপে ধাপে। প্রবালদ্বীপের জন্ম এভাবেই।

আসলে প্রবালদ্বীপের ভিত, তা প্রমাণ হলেও একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল। যে সব প্রাণীরা জলের উপর দিকে থাকতে অভ্যস্ত, কেন তাদের মৃতদেহের খোঁজ মেলে তিন-চারশো মিটার জলের তলায়? এর যে উত্তর ডারউইন দিয়েছেন সেটা জানার আগে, প্রবালকীটের আচার-আচরণের দিকটা একটু দেখা যাক।

সাগরকুসুম বা সাগরকদম্বের সগোত্র প্রবালকীট হলো সিলেনটারেটা পর্বভুক্ত একনালী সামুদ্রিক প্রাণী। প্রবালকীট বেঁচে থাকে সমুদ্রের ঢেউ-এ ভেসে আসা এককোষী উদ্ভিদ 'প্ল্যাঙ্কটন' খেয়ে। মজার কথা, শরীরের চারপাশে পাথুরে শক্ত আবরণটা তৈরী করার ব্যাপারে প্রবালকীটের নিজের কোনও কেরামতি নেই। আসলে এই সামুদ্রিক প্রাণীটির শরীরে বাসা বাঁধে 'জু-কোরেলি' আর 'জু-জ্যানথিলি' নামে দু'ধরনের মিথোজীবী শ্যাওলা। প্রবালকীটের খোলসটা বানিয়ে দেয় এরাই।

প্রবালকীটের নিজের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসা কার্বন-ডাই-অক্সাইড যোগায় তার শরীরের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া সমুদ্র শৈবালকে; সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সমুদ্রের জল আর সূর্যকিরণ থেকে সালেক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাবার বানায় শ্যাওলা, আর বাড়তি অক্সিজেনটুকু ছেড়ে দেয় প্রবালকীটের জন্য। আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে উদ্ভিদ এবং প্রাণী-জগতের মাঝে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেন-এর যে লেনদেন চলে আসছে—প্রবালের মধ্যে কীট আর শ্যাওলার ব্যাপারটা যেন তারই একটা ক্ষুদে মডেল। রাত্তিরে প্রবালকীট শিকারের সন্ধানে তার শুঁয়োগুলো বাড়িয়ে দেয়; দিনেরবেলা সেই শুঁয়োগুলোকেই আবার শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় যাতে শৈবালকোষগুলির পক্ষে সূর্যকিরণ পেতে কোনও অসুবিধে না হয়। সাগরের পরিষ্কার জলে ৩৫ থেকে ৪৫ মিটার গভীরে জলের তাপমাত্রা যেখানে ২৫° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস, সেইসব জায়গাতেই প্রবালরা বাড়ে সবচাইতে বেশী।

প্রবালকীটের চারপাশে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুণাপাথরের বর্ম, তার ক্যালসিয়ামটা যোগাড় করে প্রবালকীট নিজেই। অভিঃসরণ প্রক্রিয়ায় সাগরজলে মিশে থাকা ক্যাল-সিয়াম আয়ন এসে ঐ ক্ষুদে প্রাণীটির শরীরে ঢোকে; সাগর-শৈবালের কাজ হলো, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম, কার্বন আর অক্সিজেনকে একসাথে জুড়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বানানো। এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট-ই প্রবালকীটের চারপাশে জড়ো হয়।

প্রবালকীট মরে গেলে প্রবালের আকারে শুধু ঐ শক্ত খোলসটাই পড়ে থাকে। কঠিন প্রবাল প্রাচীরের একেবারে উপরের অংশটাই একমাত্র সজীব। নিচের অংশটা লক্ষ লক্ষ প্রবালকীটের দেহাবশেষ। লাল, হলুদ, বাদামী—রঙ্-বেরঙের যে প্রবাল আমরা দেখি সেও কিন্তু হরেক রঙের শ্যাওলার জন্যেই।

কি করে সমুদ্রের কয়েকশো মিটার গভীরে, সূর্যকিরণের অনুপস্থিতিতে প্রবালকীট আর তাদের শরীরের মধ্যে বেঁচে থাকা সমুদ্র শৈবালেরা বেড়ে ওঠে তার উত্তর দিতে গিয়ে ডারউইন সাহেব বলেছিলেন, বিশেষ পাহাড় বা আগ্নেয়-গিরির উপর প্রবালকীটরা বেড়ে উঠেছিলো, একসময় তা জলের উপর জেগে থাকলেও পরে কোনসময় ধীরে ধীরে ডুবে যায় সাগরের নিচে। প্রবালকীটদের খাদ্য হিসেবে চাই জলে ভেসে আসা প্ল্যাঙ্কটন, আর সমুদ্র শ্যাওলার প্রয়োজন জলে মিশে থাকা পুষ্টিকর নুনগুলো। সুতরাং প্রবালকীটরা ভীড় জমায় পাহাড় বা আগ্নেয়গিরির ঢালু অঞ্চলের অগভীর জলে।

আগ্নেয়গিরি বা পাহাড়ী দ্বীপের তলদেশ যখন বসে যেতে শুরু করে, প্রবালকীটরাও গভীর থেকে আরও গভীরে

তলিয়ে যেতে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য লড়াই চালাতে গিয়ে ঐসব ক্ষুদে প্রাণীরা তখন সূর্যকিরণের খোঁজে উপরের দিকে মাথাচাড়া দিতে থাকে। উপরের দিকে ওঠার সময় প্রবালকীট-দের জন্ম-মৃত্যুর চক্রও চলতে থাকে স্বাভাবিক ভাবেই; জ্যান্ত কীটদের তলায় পড়ে মৃত সাথীদের স্তূপ। পাহাড় বা আগ্নেয়-গিরিকে বেড় দিয়ে প্রবাল-বলয় তৈরী হয়ে থাকে এভাবেই। প্রতি ৩০-৩৫ বছরে গড়পড়তা ১ মিটার করে উঁচু হতে থাকে ঐ প্রবাল-বলয়।

ভারতবর্ষে প্রবাল ধারণের রীতি চলে আসছে সেই কোন্ মুনি-ঋষিদের আমল থেকেই। জ্যোতিষীরা বলেন, নবরত্নের অন্যতম এই প্রবাল নাকি মঙ্গলগ্রহের প্রিয় রত্ন। সেজন্যই প্রাচীন ভারতে এর নাম ছিলো 'ভৌগরত্ন'। সম্ভবতঃ মঙ্গলগ্রহের ঘোর লাল রঙের সাথে রক্ত প্রবালের মিল থাকার জন্যই জ্যোতিষীরা বলেন, পলা'র আঙ্টি পড়লে মঙ্গলগ্রহ তুষ্ট হবে! প্রাচীন, ভারতে চিকিৎসার কাজেও প্রবালের ব্যবহার ছিলো। আয়ুর্-বেদশাস্ত্রে প্রবালকে শ্লেষ্মা—পিত্তনাশক, বলকারী এবং কান্তি-প্রদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের রসায়নবিদরাও যে প্রবাল নিয়ে যথেষ্ট নাড়াচাড়া করেছেন তার বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। গরুড়-পুরাণে বলা হয়েছে—'পাথরের মতো কঠিন হওয়া প্রবালের স্বাভাবিক গুণ নয়। যত্ন নিয়ে জলের সাথে আগুনে সেদ্দ করলে এটা পাথরের মতো কঠিন হবে।' শুধু তাই নয়, প্রবালকে তার গুণাগুণ অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছিলো সে যুগে। যেসব রক্ত
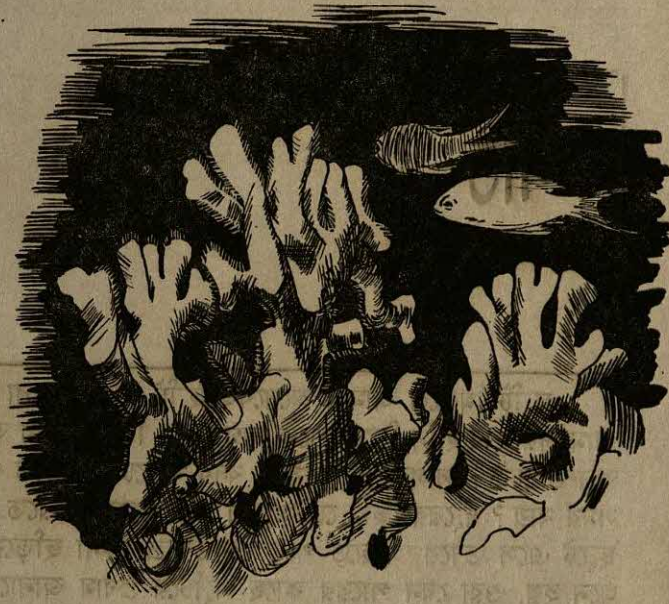
লোহিত সাগরের রক্ত প্রবাল। বৈজ্ঞানিক নাম—'মিলেপোরা'।

লাল প্রবালে একটু হলদেটে ভাব দেখা যায়, তা-ই হলো সবার সেরা এবং সকলের প্রিয়। সিঁদুরের মতো রঙ যার, তা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবাল; আর যার রঙ্ পদ্মের মতো, প্রবালের সমাজে তার জায়গা সবার নিচে। বিজ্ঞানীরা মানুন আর নাই মানুন, আমাদের দেশে সৌন্দর্যের দিক থেকে প্রবালের এই শ্রেণীবিভাগ চালু রয়েছে আজও।

সাত

ঢেউয়ের পরে ঢেউ

ছুটি মিললে আমরা অনেকেই ছুটি পুরী কিংবা দীঘা। আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে সাগর—না কি সাগরের অসংখ্য, অনন্ত ঢেউ ? সাগরপাড়ে বসলে কার না ঢেউ গুণতে গুণতে সময় যায় ? দূরের ছোট্ট ঢেউগুলো যখন গর্জন করতে করতে ছুটে এসে তীরে আছড়ে পড়ে শ্বেতশুভ্র ফেনা ছড়িয়ে দেয়, মনে হয়, ওরা যেন পায়ের কাছে লুটিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে !

দূর থেকে তীরবেগে ছুটে আসা পোষা জন্তুর হাবভাব আর ক্লান্তি যেমন তার মনিবকে জানিয়ে দেয়, কতটা পথ সে ছুটে এসেছে কিংবা পথে তাকে কোনও বিপদে পড়তে হয়েছে কিনা—তেমনি কিছু মানুষ ঢেউ দেখেই বলে দিতে পারেন, সাগরের কোন্ দূরপ্রান্তে জল আর হাওয়ার মিলনে জন্ম নিয়েছিলো সেই ঢেউ। সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে বেড়াতে যদি তেমন বিশেষজ্ঞের দেখা মেলে তবে তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায়, তীরে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর বুকে বাতাসের ঝাপ্‌টা কতটা লেগেছিলো, কিংবা সে ঢেউ ঝড়-বৃষ্টি-সাইক্লোনের বার্তা বয়ে আনছে কিনা।

সাগরের ঢেউ তার মোহিনীরূপও সময় সময় পাল্টায়। সমুদ্র যখন ঝোড়ো হাওয়ার মতো হঠাৎ হঠাৎ ফুঁসে উঠে নগর-বন্দর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা মাঝসমুদ্রে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ-এর মাথায় বড় বড় জাহাজও যখন কুটোর মতো আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে থাকে, সাগর আর তার ঢেউ-কে ঘিরে মানুষের সব মোহ তখন কেটে যায়; আতঙ্কে সে উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির, হয়ে ওঠে।

সূর্যের তাপে সমুদ্র থেকে প্রতিনিয়তঃ জলীয় বাষ্প উঠতে থাকে; গোটা পৃথিবীর সমস্ত সাগর-মহাসাগর থেকে বছরে গড়পড়তা এক মিটার পুরু জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়। জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে সমুদ্রের উপরের বাতাসটা হয়ে ওঠে ভারী। বাতাসের ভার বাড়লে সমুদ্রের জলের উপর তার চাপটা বাড়ে; স্বভাবতঃই জলতল সংকুচিত হয়। ফলে, বাতাসের চাপ যেখানে কম, জল সেখানে ফুলে ফেঁপে ওঠে। সাগরের বুকে হয় অশান্ত ঢেউয়ের সৃষ্টি।

পুকুরের জলে ঢিল ফেললে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ যেমন ছড়িয়ে পড়ে চারধারে, তেমনি বাতাসের চাপে সমুদ্রের বুকে যে ঢেউ জাগে, দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তা। ঢেউ-এর জন্ম-মুহূর্তে সমুদ্রের জল যেই খাড়া হয়ে উপরে ওঠে, ঢেউ-এর সেই খাড়াই গায়ে অমনি বাতাসের চাপ পড়ে; ফলে, আরও উঁচু হয়ে ওঠে তা।

বাতাসের গতিবেগই ঠিক করে দেয়, ঢেউ-টা কতটা উঁচু হবে এবং কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। যেহেতু জলের উপর বাতাসের চাপ প্রতিমুহূর্তে বদলায়, সেই বাতাস থেকে সাগরের বুকে যে ঢেউ জাগে তাদের পর পর দুটোর আকারও

কখনো একরকম হয় না। কোনটার চূড়া হয় পাহাড়প্রমাণ উঁচু, কোনটা বা জলরেখার উপরে উঠতেই পারে না; কোন ঢেউ একেক বারে লম্বা পথ পাড়ি দেয়, আবার কোন কোনটার দৈর্ঘ্য নেহাতই কম।

বাতাসের গতিবেগ তো বটেই, সেইসঙ্গে সমুদ্রের বিস্তৃতিও ঢেউ-এর স্বরূপ ঠিক করে দেয়। সংকীর্ণ উপসাগরে দুরন্ত বেগে বাতাস বইলেও তা থেকে বড়সড় ঢেউ-এর জন্ম হয় না। সাধারণতঃ বাতাসের গতিবেগ যদি ঘন্টায় ৪ মাইলের কম হয়, তবে সমুদ্রের বুকে যে মৃদু আলোড়ন জাগে তা কিছুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেও তাকে 'ঢেউ' বলা চলে না।

নাবিকদের অভিজ্ঞতায় বলে, বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় মাইলের হিসেবে যা হবে, ঢেউ-এর উচ্চতা হবে 'ফুট'-এর হিসেবে তার ঠিক অর্ধেক; অর্থাৎ, সমুদ্রের কোনও জায়গায় যদি ঘন্টায় ৮০ মাইল বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয় তবে সেখানকার ঢেউগুলি হবে কমবেশি ৪০ ফুট উঁচু। এটা অবশ্য একটা সাধারণ নিয়ম; সময় বিশেষে ঐ ঢেউগুলির কোন কোনটা অনেক বেশি উঁচুও হতে পারে।

আবার ঢেউগুলির এগিয়ে চলার বেগও নির্ভর করে বাতাসের গতিবেগের উপর। অনেকক্ষণ ধরে বাতাস যদি একই বেগে বইতে থাকে তবে সমুদ্রতরঙ্গ বাতাসের গতিবেগকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। আবার দেখা গেছে, বাতাস এবং ঢেউ-এর গতিবেগ যখন সমান-সমান হয় তখনই ঢেউগুলির চূড়া হয় সবচেয়ে উঁচু। নাবিকরা লক্ষ্য করেছেন, প্রচন্ড ঝোড়ো বাতাসের সময় ঢেউগুলো যতটা উঁচু হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি উঁচু হয় যখন ঝড়ের পর বাতাসের বেগ খানিকটা কমে আসে; অর্থাৎ, বাতাসের বেগ যখন ঢেউ-এর বেগের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অকূল সমুদ্রে চোখ ফেললে মনে হবেই, ঢেউগুলো যেন জলকে ঠেলে নিয়ে চলেছে সাগরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বাস্তবে ব্যাপারটা তা নয়। সমুদ্রের জল সত্যি সত্যিই এক দিক থেকে অন্য দিকে ছুটে চললে—সাগরের বুকে মানুষকে আর জাহাজ-নৌকো
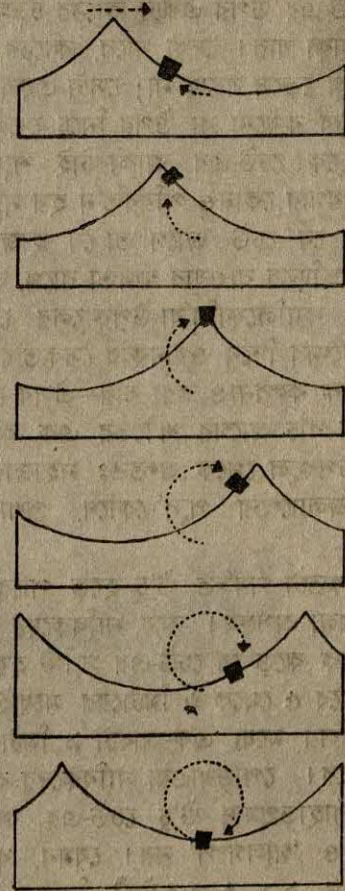
জলের মধ্যে ঢেউ-এর আকারটাই শুধু ছুটে চলে, জলকণারা যে জায়গা পরিবর্তন করে না তা ঢেউ-এর মাঝে একটা হাল্কা কর্কের টুকরো ফেলে দিলেই বোঝা যায়। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঢেউ-এর সাথে কর্ক-টা একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

বাইতে হতো না! ব্যাপারটা হয় কি, বাতাসের চাপে জলকণাগুলো চক্রাকার বৃত্তের মধ্যে পাক খেতে থাকে। ফলে সাগরের বুকে জাগে ঢেউ; ঐ বৃত্তের ব্যাস যত বেশি হয়, ঢেউ-ও তত উঁচু হতে থাকে। ঢেউ-এর উপর একটা কাঠের টুকরো ফেলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায়। দেখা যাবে, কাঠের টুকরোটা মোটেই ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে না; সেটা একবার সামনে, একবার পিছনে আবার কখনো বা উপর-নিচে দোলা খাচ্ছে। আসলে সমুদ্রের বুকে ঢেউ-এর আকারটাই শুধু এগিয়ে চলে, জলকণাদের জায়গার কোনও পরিবর্তন হয় না।

সাগরের বুকে যে ঢেউ জাগে তা যে হাজার হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে, তার নজির হিসেবে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া-উপকূলের ঢেউগুলোর কথাই ধরা যাক। গ্রীষ্মের দিনে ওখানকার সৈকত থেকে ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে কি কল্পনাও করা যায়—ঐসব ঢেউগুলির জন্ম হয়েছে মাস চার-পাঁচ আগের শীতের এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনে—আমেরিকার উপকূল থেকে অন্ততঃ নহাজার কিলোমিটার দূরে নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব-কোণে, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে!

সমুদ্রের ঢেউ কতটা পর্যন্ত উঁচু হতে পারে তা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা অসম্ভব। তবে, নাবিকদের অভিজ্ঞতা বলে, সাধারণ সামুদ্রিক ঝড়ে যে ঢেউ-এর সৃষ্টি হয় সেগুলি লম্বায় মোটামুটি ভাবে ৫ থেকে ৬ মিটারের মধ্যেই থাকবে। তবে এইসব ঢেউগুলির মধ্যে এক-আধটা ৯ মিটার বা তার চেয়েও উঁচু হতে পারে। পোড়খাওয়া নাবিকদের কাছ থেকে কখনো-সখনো যে পাহাড়প্রমাণ উঁচু ঢেউ-এর কথা শোনা যায়, তা কিন্তু মোটেও 'গালগপ্প' নয়। যেমন, বলেছিলেন 'অ্যাসক্যানিয়াস' নামে ১২ হাজার-টনী বিশাল জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলসন। জাহাজের মাস্তুলের উপর যে কাঠের পাটাতন থাকে—তাকে নাবিকরা মজা করে বলে 'কাকের বাসা'। ১৯২১ সালে একদিন মাঝসাগরে নিজের জাহাজের 'কাকের বাসা'য় দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে দূরের সমুদ্র দেখার সময় হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়লেন ক্যাপ্টেন উইলসন। ওঁর কথায় জানা গেল, জল থেকে প্রায় ১৮ মিটার উঁচুতে যে প্ল্যাটফর্মে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তারও ৩ মিটার উপর দিয়ে ঢেউ চলে যায়। বছর দেড়েক বাদে 'ম্যাজেস্টিক' জাহাজের ক্যাপ্টেনও একই রকম ঢেউ-এর কথা বলেছিলেন, উচ্চতা যার ছিলো প্রায় ২৫ মিটার। বিশেষজ্ঞরা দুটো জাহাজই খুঁটিয়ে দেখে এবং জাহাজের যাত্রীদের বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে নিঃসন্দেহ, জাহাজ-দুটো সত্যিসত্যিই ১৮ থেকে ২৭ মিটার উঁচু ঢেউ-এর কবলে পড়েছিলো।

এযাবৎকালে সবচেয়ে উঁচু ঢেউ-এর সাক্ষী, মার্কিন নৌবাহিনীর লেফটেনান্ট কমাণ্ডার 'হোয়াইটমার্স'। ১৯৩৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী—'রামাপো' নামে নৌ-ট্যাঙ্কারটি ম্যানিলা থেকে সান-ডিয়েগো আসার পথে ভয়ঙ্কর 'টাইফুন' ঝড়ের কবলে পড়ে। মাঝরাত্রের দিকে হোয়াইটমার্স নিদারুণ আতঙ্কে লক্ষ্য করলেন, বিশাল ঢেউ জাহাজটার সবচেয়ে উঁচু মাস্তুলের ডগা ছুঁয়ে যাচ্ছে। পরে হিসেব কষে দেখা গেলো; ঢেউটার উচ্চতা ছিলো নিদেনপক্ষে ৩৪ মিটার।

পাড়ের দিকে ঢেউ যতই এগিয়ে আসে তার গতিও তত কমে আসে। সামনের ঢেউ-এর গতি যখন মন্থর হয়ে আসে, পেছনের ঢেউ-এর গতি তার চেয়ে বেশী হওয়ার দরুণ ঢেউ-এ ঢেউ-এ যে ধাক্কাধাক্কি হয়, তার ফলেই সাময়িকভাবে ঢেউ উঁচু হয়ে উঠে চারপাশে ফেনা ছড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

কোন্ ঢেউ কোথায় ভেঙে পড়বে তারও একটা হিসেব আছে। সাধারণতঃ ঢেউ-টা যদি ৩ মিটার উঁচু হয় তবে পাড়ের কাছাকাছি যেখানে জলের গভীরতা ৪ মিটার সেইরকম জায়গায় এসে ঢেউটা ভেঙে পড়ে।

ডাঙা, সমুদ্র আর বাতাস—এই নিয়ে আমাদের যে পৃথিবী—তার প্রতিটি কণা চাঁদ-সূর্যের টানে দিনে পাক্কা

দু'বার করে ওঠানামা করে; একেই বলে জোয়ার-ভাঁটা। ভূ-ত্বক শক্ত আঁটোসাটো; চাঁদ-সূর্যের টানে তার ওঠানামাটা সমুদ্রের জলের তুলনায় অনেক কম। আবার জলের তুলনায় বাতাস যেহেতু অনেক বেশী হাল্কা, সুতরাং জোয়ারের সময় জলের তুলনায় বাতাস অনেক বেশি উপরে ওঠে। মোটামুটি হিসেবে —জোয়ারের সময় কোনদিন পৃথিবীর ভূ-ত্বক যখন ১৫ সেন্টিমিটার ফুলে ওঠে, সাগরের জল তখন ফেঁপে ওঠে মিটার তিনেক উঁচুতে আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অন্ততঃ বেশ কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাটি আর বাতাসের ফুলে ওঠাটা টের পাওয়া না গেলেও—দিনে দুবার জোয়ার-ভাঁটা দেখে জলের ওঠানামার ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সমুদ্রের জল যে প্রতিদিন নির্দিষ্ট ছন্দে ওঠানামা করে মানুষের তা নজরে এসেছিলো প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। নরওয়ের নাবিকরা বলতো, সমুদ্র জীবন্ত। জোয়ার-ভাঁটা তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। জোয়ারের সময় নদীতে বান আসে, সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে নদীতে; অনেক সময়ে তা উজিয়ে চলে যায় বহুদূর পর্যন্ত।

প্রাগৈতিহাসিক আমলে যেসব মানুষ সমুদ্রোপকূলে বাস করতো, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা তাদের কাছে ছিলো আশীর্বাদ। জোয়ারের সময় শামুক, ঝিনুক আর রকমারি মাছ এসে ডাঙগায় আছড়ে পড়ে; ভাঁটার সময় জল সরে যেতে সেগুলি পড়ে থাকে তীরভূমিতে। সমুদ্রতীরের যেসব জায়গায় মানুষের বাস ছিলো তার চারপাশে জমে থাকা শামুক-ঝিনুকের খোলার স্তূপই সাক্ষ্য দেয়, জোয়ার-ভাঁটা কিভাবে একদিন মানুষের ক্ষিধে মিটিয়েছে।

জোয়ারের সঙ্গে চাঁদের কলার সম্পর্কটা প্রথম লক্ষ্য করেন পাইথিয়াস—প্রায় ২৩০০ বছর আগে; অবশ্য সে সম্পর্কের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা মিলেছে নিউটনের অভিকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের পর। জানা গেছে—চাঁদের চাইতে সূর্য ৩ কোটি গুণ বড়ো হলেও পৃথিবী থেকে চাঁদের তুলনায় তা রয়েছে ৩৯০ গুণ
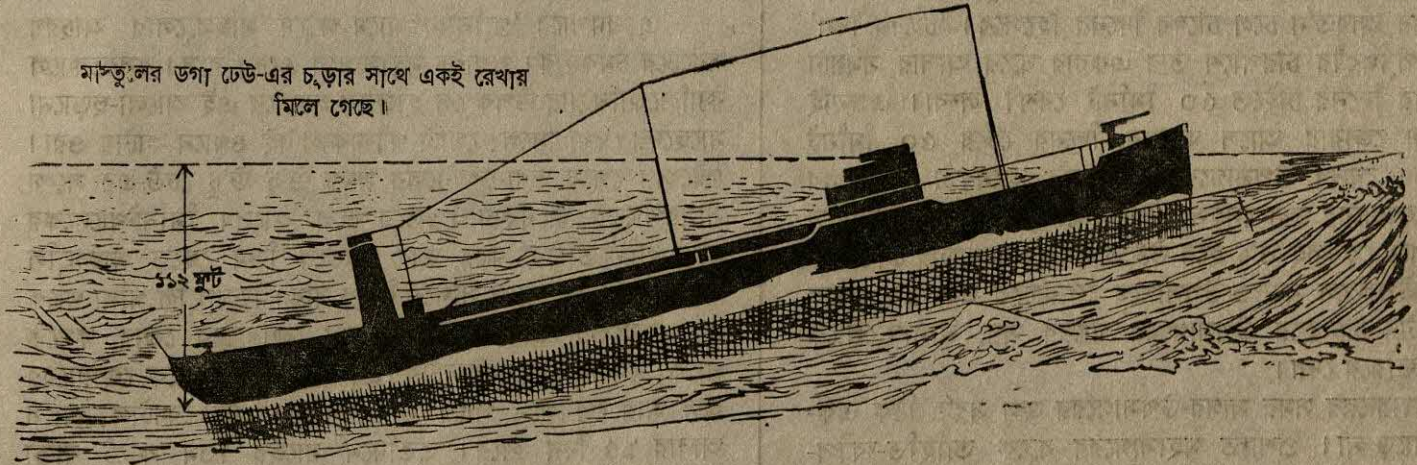
১৯৩৩ সালে ১১২ ফুট উঁচু ঢেউ-এর মুখে পড়েছিলো মার্কিন নৌবহরের এক জাহাজ। জাহাজের কাকের বাসা থেকে জনৈক নাবিক দেখেছিলো মাস্তুলের ডগা এবং ঢেউ-এর চূড়া যেন একই রেখায় চলে এসেছে। এ থেকেই ঢেউ-এর উচ্চতা মাপা হয়॥

বেশী দূরে। চাঁদ একটা ক্ষুদে উপগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র পৃথিবীর কাছে থাকার দরুণ সূর্যের তুলনায় পৃথিবীকে সে ২·১৭ গুণ বেশী জোরে নিজের দিকে টানতে পারে। অবশ্য চাঁদের ঐ আকর্ষণী শক্তি পৃথিবীর নিজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ৯০ লক্ষ ভাগের মাত্র ১ ভাগ। যেদিক থেকে, চাঁদের টানে মহা-সাগরের জলকণারা যে তাদের ৯০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ ওজন হারায় তাতেই তারা কয়েক মিটার পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে। পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যায় সূর্য এবং চাঁদ যখন একই রেখায় থাকে তখন পৃথিবীর প্রতি দুয়ের আকর্ষণ একসঙ্গে মিলে যায়; ফলে জোয়ারের জল সর্বোচ্চ সীমায় পেঁছয়। একেই বলে 'ভরা কোটাল'। আবার যখন পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে ১ সমকোণের ফারাক হলে—জোয়ারের টানটা হয় তখন সবচেয়ে কম। এই রকম জোয়ারকেই আমরা বলি 'মরা কোটাল'। সাধারণতঃ কৃষ্ণা আর শুক্লা অষ্টমীতেই মরা কোটাল আসে নদীতে।

জোয়ার-ভাঁটার ক্ষেত্রে যেহেতু চাঁদের ভূমিকাটাই বড়ো, জোয়ারের আবর্তন চলে চাঁদের দিনের হিসেবে। 'চাঁদের দিন' অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশে তার একবার ঘুরে আসার সময়টা পৃথিবীর দিনের চাইতে ৫০ মিনিট বেশী লম্বা। এজন্যই প্রতিদিন জোয়ার আসে আগের দিনের চেয়ে ৫০ মিনিট দেরীতে। যেসব উপসাগরের আকারটা অনেকটা ফানেলের মতো, জোয়ারের জল সেইসব উপসাগরের সঙ্কীর্ণ মুখে এসে বাধা পেয়ে কেবলই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। কানাডার নেভাস্ক-টিয়ার উপকূলে ফান্ডি-উপসাগরে জোয়ারের জল ১২ থেকে ১৫ মিটার উঁচু হয়ে উপসাগরের গায়ের সরু নালাগুলোকে ফেনায় ভরিয়ে দেয়।

জোয়ারের সময় সাগর-উপসাগরের জল সর্বত্র ঠিক এক-ভাবে বাড়ে না। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাহিতি-দ্বীপ-পুঞ্জের উপকূলে জোয়ার আসে রোজ একই সময়ে! তাহিতির লোকেরা মজা করে বলতো,—'আমাদের সমুদ্র চাঁদকে থোড়াই মানে। ওর বুকে জোয়ার-ভাঁটার খেলা হয় শুধু সূর্যেরই টানে।' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে—সাধারণভাবে চান্দ্র-জোয়ার সৌর-জোয়ারের তুলনায় ২·১৭ গুণ বেশী শক্তিশালী হলেও তাহিতি'র ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ওখানকার উপকূলে চাঁদের টান সূর্যের তুলনায় মাত্র শতকরা ২০ ভাগ বেশী জোরালো। সুতরাং ওখানকার জোয়ার-ভাঁটার ক্ষেত্রে সূর্যের ভূমিকা যথেষ্ট জোরালো এবং অন্য জায়গার তুলনায় ওখানকার জোয়ার-ভাঁটার চরিত্র অমন বেখেয়ালী!

জোয়ার-ভাঁটায় কোনও কোনও সমুদ্রোপকূলের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি পালা করে দিনের মধ্যে দু'বার জলে ডুবে যায়, আবার খানিক পরেই ভেসে ওঠে। সাগরতীরের ঐ অংশে যেসব প্রাণীর বাস—জোয়ার-ভাঁটার সাথে তারাও তাদের জীবনযাত্রাকে অদ্ভুতভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ভাঁটার সময় শুকনো সৈকতে যেসব শামুক ছড়িয়ে থাকে তারা বালির গায়ে তাদের খোলা শক্ত করে এঁটে ধরে পরের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করে।

এ ব্যাপারে 'গ্রুনিয়ন'-নামে ক্ষুদে মাছগুলোর আচরণ সবচেয়ে চমকদার। প্রশান্ত মহাসাগরে এদের বাস। বসন্তকালে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে হাজারে হাজারে এই আলো-ছড়ানো মাছেদের দেখা মেলে; গোটা গ্রীষ্মকালটাই ওখানে কাটায় ওরা। গ্রীষ্মের শেষে ভরা-কোটালের সময় উঁচু উঁচু ঢেউ-এর সঙ্গে সাগরপাড়ের অনেকটা ভেতরে চলে আসে। মিনিটখানেকের মধ্যে বালিতে গর্ত করে, তার ভেতরে ডিম ছেড়ে মাছগুলি আবার ঢেউ-এর সাথে সাগরে ফিরে যায়। ডিমগুলি গাঁথা থাকে বালির মধ্যে। ভরা কোটালের পর জোয়ারের জোর কমতে থাকে; বালিয়াড়ির যেখানটায় ডিমগুলি পোঁতা থাকে, জোয়ারের জল আর পেঁছতে পারে না সেখানে। ভরা-কোটাল আসে আবার ১৫ দিন পরে। ততদিনে মাছের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার সময় হয়ে যায়। ভরা-কোটালের জল এসে ডিমের খোলায় ঝাপ্টা দিতেই, তা ফেটে 'গ্রুনিয়ন' মাছের বাচ্চা

বেরিয়ে আসে; তারপর ঐ জোয়ারের জলেই ভাসতে ভাসতে সাগর পানে চলা শুরু হয়ে যায় তাদের।

ব্রিটেনের জোয়ার-এলাকায় চ্যাপ্টা কীট 'কনভোলিউটা রোসকোফেনসিস' সবুজ শ্যাওলার সাথে মিশে থাকে এবং তার থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাড় করে নেয়। শ্যাওলাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চাই সূর্যের আলো। সেই আলোর জন্যই ভাঁটার সময় এরা সাগরতীর ছেয়ে থাকে; জোয়ারের জল আসা-মাত্রই বালির মধ্যে ঢুকে যায় এরা—জল সরে গেলেই আবার বালির ভেতর থেকে মুখ তোলে। মজার কথা, অ্যাকোরিয়ামের বালি আর জলের মধ্যে এদের রেখে দিলেও দেখা যায়—ওখানেও দিনের মধ্যে ঠিক দু'বার বালিতে মুখ গোঁজা আর জলে ভেসে ওঠার কাজ চালিয়ে যায় ওরা। বেঁচে থাকার বিচিত্র কাহিনী—ঐটুকু ক্ষুদে 'কন্‌ভোলিউটা' কেমন অদ্ভুতভাবে তার ছোট্ট শরীরটাকে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার ছন্দের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে!

সমুদ্রের পাড়ে ঢেউ আছড়ে পড়ার সাথে সাথে সৈকত ভাঙাগড়ার কাজও চলতে থাকে অবিরাম। তীরের কাছে অগভীর জলে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে গিয়ে যে ফেনা ছড়িয়ে দেয় সেই ফেনা জলের তলায় ছড়িয়ে থাকা বালিকণাকে পাড়ে এনে জড়ো করে। একদিকে ঢেউ যখন বালিয়াড়ি ভেঙে তছনছ করে, সমুদ্রের ফেনা তখন আর একদিকে নতুন সৈকত গড়ে তুলতে থাকে। হামেশাই দেখা গেছে দুচার বছরের মধ্যে সমুদ্র সৈকত তার পুরনো জায়গা ছেড়ে কয়েক কিলোমিটার সরে গেছে।

সাধারণতঃ আবহাওয়া যখন পরিষ্কার থাকে, সাগরের ফেনা মহাদেশীয় সোপান থেকে বালি তুলে এনে উপকূলের কাছে অগভীর অঞ্চলগুলি ভরাট করতে থাকে। কখনও কখনও বালির স্তূপকে দিনে ৩ মিটার করে উঁচু হতেও দেখা যায়। কখনও কখনও তাই সমুদ্রের ভেতর বহুদূর পর্যন্ত চলে গেলেও মনে হয়, জল হাঁটুর উপরে আর উঠছে না। আবার সমুদ্রে যেই একবার ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়, অমনি বিশাল বিশাল ঢেউ বহু দিনের জমানো বালিকে আবার টেনে নিয়ে যায় সমুদ্রের গভীরে। তখন সাগর-সৈকতের চেহারা আবার যে কে সেই!

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

ঢেউ-এর পর পর দু'টো চূড়ার মধ্যে দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। ঢেউ-এর জন্য জলকণাগুলি বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে; জলের নিচে যতই যাওয়া যায়, বৃত্তগুলিও ততই ছোট হতে থাকে।
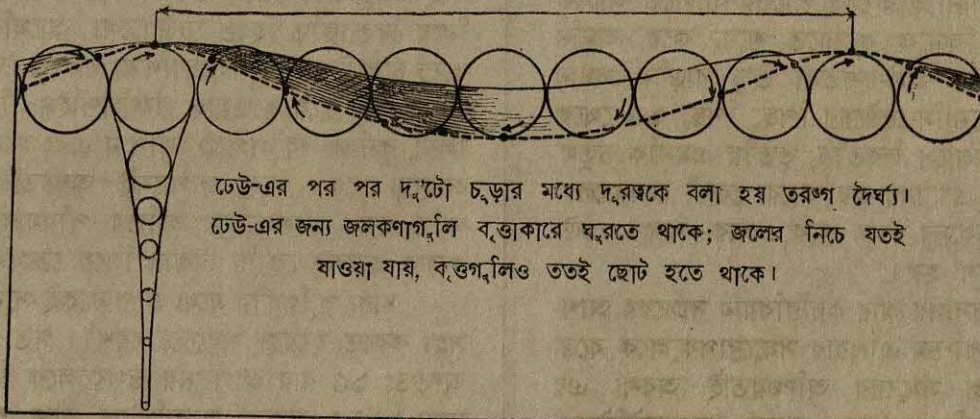
সমুদ্রের ঢেউ-এর মধ্যে যে কী প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে, তা বোঝা যায় যখন সাগরকে রুখতে মানুষের তৈরী কৃত্রিম বাঁধগুলিকে সে ভেঙেগ তছনছ করে। হিসেব কষে দেখা গেছে, একটা মাত্র ৩·৬ মিটার উঁচু ঢেউ খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকা জেটির দেওয়ালের গায়ে প্রতি মুহূর্তে যে চাপ দেয় তার পরিমাণ প্রতি বর্গ মিটারে ৭·৮ টন।

সমুদ্রের নিচে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে যে তরঙ্গের জন্ম হয় সেগুলির মতো মারাত্মক আর কিছুই না। জাপানী ভাষায় এদের বলে 'সুনামি'। উন্মুক্ত সাগরে এই ঢেউ আধ-মিটারের বেশী না হলেও অবিশ্বাস্য গতিতে এরা ধেয়ে যেতে থাকে। কখনো কখনো এরকম একটা ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। তীরের কাছে অগভীর জলে ঢোকা মাত্র ঢেউগুলো পাহাড় প্রমাণ উঁচু হতে থাকে; ৩০ মিটার উঁচু ঢেউ যদি পাড়ে এসে আছড়ে পড়ে তবে তার আঘাতে হাজারে হাজারে মানুষ আর তাদের ঘরবাড়ি যে ভেসে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

সাধারণতঃ প্রথম সুনামি-ঢেউটা পাড়ে এসে আছড়ে পড়ার ঠিক আগেই সমুদ্র হঠাৎ পিছু হঠে যায়। সাগরতীরের বাসিন্দারা আনন্দে আটখানা হয়ে সেই পাড়ের বালিতে আটকে পড়া মাছ, কাঁকড়া আর ঝিনুক কুড়োতে শুরু করে, অমনি ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে আসে আট-দশতলা উঁচু বাড়ীর সমান ঢেউ। পয়লা নম্বর সুনামি-ঢেউয়ের পিছু পিছু ১৫ থেকে ২০ মিনিটের ব্যবধানে আসে দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থ ঢেউ; প্রথমটার তুলনায় এগুলো হয় আরো বেশী জোরালো। পয়লা-নম্বর ঢেউ যে ধ্বংসের কাজ শুরু করে—পরের ঢেউগুলোর হাতে তা সম্পূর্ণ হয়।

সুনামি-ঢেউ ভূমধ্যসাগর আর ক্যারিবিয়ান সাগরের আশপাশের দেশগুলি আর পশ্চিম এশিয়ার সমুদ্রোপকূলকে বড়ো ভালবাসে। ঐসব অঞ্চলে সমুদ্রের অস্থিরতাই অবশ্য এর কারণ। ১৯৪৬ সালে বেরিং-সাগরের তলায় 'অ্যালেউটিয়ান' নামে এক গিরিখাতে যে ধস নেমেছিলো তার ফলে যে সুনামি'র জন্ম হয় তা ঐ বছরের পয়লা এপ্রিল এসে ধাক্কা খায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা গেছে, ৬ থেকে ৮ মিটার উঁচু ঢেউগুলি ১৫ থেকে ১৭ মিনিটের ব্যবধানে পর পর এসেছিলো। এদের গতিবেগ ছিলো ঘণ্টায় ৮০০ কিলোমিটারেরও বেশী। ওখানকার উপকূল অঞ্চল জনবিরল হওয়ার দরুন কয়েকশোর বেশী মানুষ অবশ্য সেবার মারা পড়ে নি। দ্বীপ থেকে খানিকটা দূরে নোঙর করে রাখা এক জাহাজের ক্যাপ্টেন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখেছিলেন দূরের বন্দরে সুনামি'র ধ্বংসলীলা। অথচ, সেই ঢেউ কখন যে তাঁর জাহাজের তলা দিয়ে চলে গেছে—তা তিনি টেরই পান নি।

১৯৬০ সালের মে মাসে চিলি'তে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। চিলির সেই ভূমিকম্প সম্ভবতঃ সমুদ্রগর্ভে বড়োসড়ো পরিবর্তন আনে। এরই ফলে যে সুনামি'র জন্ম হয় তার প্রথম ধাক্কাটা এসে পড়ে ঐ দেশেরই উপকূলে। ঢেউ আসার আগাম সংকেত মানুষদের জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে তাদের বাঁচানো যায় নি। চিলির বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলোকে ভেঙ্গে তছনছ করে এবং বহু লোককে ভাসিয়ে নিয়ে দৈত্যাকৃতি হিংস্র ঢেউগুলো আমেরিকার উপকূল ধরে ছুটে চলে উত্তরে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত; তারপর প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে হাওয়াই, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্যুরিল দ্বীপপুঞ্জ, জাপান এবং কামচাটকার উপকূলেও আছড়ে পড়ে। শুধু জাপানেই অন্ততঃ ৩৬,০০০ ঘরবাড়ীর ক্ষতি হয়। দেশগুলির ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করলে তা কয়েক হাজার কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকবে।

সারা পৃথিবীর মধ্যে জাপানকেই সুনামি-ঢেউ-এর হামলা সহ্য করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী। গত ৪০০ বছরে সুনামি অন্ততঃ ১৫ বার জাপানের উপকূলকে বিধ্বস্ত করেছে; এর মধ্যে ১৮৯৬ সালের সুনামি'তে প্রাণ হারায় ২৭,১২২ জন

মানুষ। তবে ১৮৮৩ সালে 'ক্রাকাতোয়া'—দ্বীপের বিস্ফোরণের ফলে যে সুনামির জন্ম হয়—ধ্বংসলীলার দিক থেকে এখন পর্যন্ত তাকে কেউ টেক্কা দিতে পারে নি। পৃথিবীর হেন সমুদ্রোপকূল নেই যেখানে সেই ঢেউ-এর সামান্যতম অংশও গিয়ে পৌঁছয়নি।

•

সাগরের ঢেউ-এর গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরীর পরিকল্পনা শুরু হয় ষাট-এর দশকে। হিসেব কষে দেখা গেছে—ঝোড়ো হাওয়ায় অতলান্তিক মহাসাগরে যে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ ওঠে সেগুলির প্রতি মিটার উচ্চতায় ৯৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত শক্তি সঞ্চিত থাকতে পারে।

সাগরের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন, সুইডেন, কানাডা, পেরু, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম এবং আয়ার্ল্যান্ডকে নিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে এক আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা। ১৯৮০ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটনে এই সংস্থার উদ্যোগে বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনও হয়ে গেছে। সম্প্রতি জাপানে 'কাইমি' নামে এক বিশেষ ধরনের জাহাজ তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে ঢেউ-এর সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে ২০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব।

শুধু ঢেউ নয়, সাগরের জোয়ার-ভাঁটাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় তা নিয়েও বিজ্ঞানীমহলের মাথাব্যথা চলেছে বহুদিন ধরে। ১৯৬১ সালে ফরাসী বিজ্ঞানীরা ভূমধ্যসাগরের তীরে রান্‌স্ নদীর খাড়িতে সাগরের জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রথম বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র তৈরীর কাজ শুরু করেন। কেন্দ্রটি চালু হয় ১৯৬৭ সালে। আমাদের হিসেবে ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীতে খরচ পড়েছিলো প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

এভাবে বিদ্যুৎ তৈরীর কায়দাটা সহজ। এতে জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলকে বাঁধ দিয়ে আটকিয়ে, পরে সেই সঞ্চিত জলের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পৃথিবীর সব সমুদ্রোপকূলেই অবশ্য এ জাতীয় বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দেখা গেছে, যে সব জায়গায় উপসাগর বা খাড়ির মুখটা ফানেলের মতো সরু হওয়ার দরুন সেখানে বাঁধ দেওয়া সম্ভব এবং জোয়ারের সময় জলের উচ্চতা অন্ততঃ ৪ মিটার বাড়ে, কেবলমাত্র সেইসব জায়গায় এ জাতীয় সমুদ্র-বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব। সারা পৃথিবীতে এই ধরনের প্রায় দু'ডজন সমুদ্রোপকূলের সন্ধান মিলেছে, যার মধ্যে ভারতের কচ্ছ এবং ক্যাম্বে উপকূল অন্যতম। আশা করা যায়, আমাদের দেশেও একদিন নিশ্চয়ই এভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হবে।

জোয়ার-ভাঁটা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির চেষ্টা এযাবৎ সফল হয়েছে ফ্রান্স আর সোভিয়েত রাশিয়ায়। রাশিয়ার ব্যারেন্টস্ সাগরের তীরে কিসলয় খাড়ি অঞ্চলে এই ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে, যদিও এর প্রারম্ভিক ক্ষমতা ছিলো মাত্র ১২০০ কিলোওয়াট। শীগ্গিরই রাশিয়ার উত্তর উপকূলে 'মুর-মিনেস্ক'-এ একটা বড়োসড়ো বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হবে। সেদিক থেকে ফ্রান্সের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির ২৪টা টারবাইনের প্রত্যেকটি সমুদ্রের জোয়ার থেকে প্রায় ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে সক্ষম।

দেখা গেছে ছোট ছোট টারবাইনের সাহায্যে বেশ কম খরচে সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব। নদী নালায় স্রোতের মুখে অথবা সমুদ্রের খাঁড়িতে, যেখানে জল গভীর না হলেও তার স্রোত খুবই বেশী, সেরকম জায়গায় ঐ টারবাইনগুলোকে ইচ্ছেমতো বসিয়ে কম খরচে বিদ্যুৎ তৈরী করে স্থানীয় চাহিদা মেটানো যায়। জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলের বেশ কিছু জায়গায় এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

আট

সে অনেক-অনেক কাল আগের কথা। দুই ভাই, বড় ভাই ধূর্ত, ছোট ভাই সাদাসিধে সরল। স্বাভাবিকভাবেই বড় ভাই যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ধনীলোক, ছোট ভাই এতই গরীব যে, দিন আর চলে না। দুবেলা দুমুঠো জোটাতেই প্রাণান্ত। তবুও দাদাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, শ্রদ্ধাভক্তি করে দেবতার মতো।

একদিন হঠাৎ পথ চলতে চলতে ছোট ভাই কুড়িয়ে পেল একটা পাথরের জাঁতা। কি ভেবে সে সেটাকে বাড়ি নিয়ে এলো। বৌ তো সেটাকে দেখে কপাল চাপড়ে কাঁদে, হায়, যার ঘরে একমুঠো চাল নেই, এই জাঁতা দিয়ে সে করবেটা কি! রাগে দুঃখে ছোট ভাই তাতে মারলো এক লাথি। ব্যস, তাজ্জব কাণ্ড! জাঁতাটা ঘুরতে শুরু করলো আর তা থেকে বেরুতে লাগলো দুধের মতো সাদা ধবধবে লবণ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চমৎকৃত—বাঃ কী চমৎকার নুন! বিক্রি করে অনেক পয়সা হবে।

কিন্তু জাঁতা যে আর থামে না, ঘুরেই চলেছে অবিরাম। লবণের পাহাড় জমে গেছে, বাড়িঘর ধ্বসে পড়ে বুঝি। ছোট ভাই কিছুতেই থামাতে না পেরে 'ধুত্তোর' বলে মারলো তাতে এক লাথি। জাঁতা গেল উলটে, থেমেও গেল সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর যা হয়, লবণের কল্যাণে ছোট ভাইয়ের অবস্থা গেল ফিরে। অন্যদিকে বড় ভাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয়, পাপের ফল ফলতে শুরু করে। ঘরবাড়ি, জমাজমি সবই বিক্রি হবার অবস্থায়।

একদিন বৌয়ের কথায় বড় ভাই গেল ছোট ভাইয়ের কাছে। ধার চায় জাঁতাটা। ছোট ভাই পড়ল মহা মুশকিলে। দাদা চাইছে, কি করে সে? অগত্যা দিয়েই দিল সে জাঁতাটা।

বড় ভাই কিন্তু জাঁতা চালানোর কায়দাটা দেখেছিল, বন্ধ করার উপায় জানে না। জাঁতা সে চালিয়ে দিল, তৈরি হতে লাগলো নুনের পাহাড়। কিন্তু থামে না জাঁতা—ঘুরেই চলে। বাড়িঘর ধসে পড়ে, শুধু নুন আর নুন। রাগে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বড় ভাই সেটাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে গড়িয়ে দিলো। চলতে শুরু করলো জাঁতা...চলছে তো চলছেই...এসে পড়লো সমুদ্রের পাড়ে। তারপর ডুবে গেল সমুদ্রে।

সেই থেকে জাঁতা সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে চলেছে অবিরাম। তৈরী হচ্ছে লবণ। আর সেজন্যেই তো সাগরের জল এতো নোনতা।...

এশিয়ার প্রাচীন এই রূপকথার জাঁতাকল থেকে না হলেও সমুদ্রের বুকে যে অহর্নিশ লবণ তৈরী হয়ে চলেছে এবং সাগরের জল যে আরো, আরো বেশী লবণাক্ত হয়ে উঠছে, এমন কথা এই সেদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরাও বলতেন।

এর পেছনে জোরালো যুক্তিটা হলোঃ প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ার এমনকি মাছেদের শরীরেও নুনের ভাগ ছিলো এখনকার তুলনায় ঢের কম। সেক্ষেত্রে কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রের জলে যে নুনের ভাগ কম ছিলো এমনটা মনে হওয়াই

স্বাভাবিক। তাছাড়া ১৬৭০ সালে সমুদ্র-রসায়ন বিদ্যার জনক রবার্ট বয়েল নদীর জল পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, সামান্য পরিমাণে হলেও সেই জল প্রতিনিয়ত নুন বয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রে। বয়েল-এর কথার সূত্র ধরে ১৭১৫ সালে এডমন্ড হ্যালি-নামে জনৈক বিজ্ঞানী বললেন, যেহেতু সৃষ্টির গোড়ায় সমুদ্রের জলে নুন ছিলো না, এবং বছরের পর বছর ধরে নদীর জল মহাদেশগুলো থেকে নুন এনে সমুদ্রে ফেলেছে, সুতরাং প্রতি বছর পৃথিবীর সমস্ত নদী মারফৎ যে পরিমাণ নুন এসে সমুদ্রে মেশে এবং সমুদ্রে মোট যে পরিমাণ নুন রয়েছে এই দু'এর হিসেব থেকে সমুদ্রের বয়স কষে বের করা মোটেই অসম্ভব নয়।

সেসময় হ্যালি তো রীতিমতো আক্ষেপ করেছেন—আহারে, দু'হাজার বছর আগের গ্রীক রোমানরা কেন তখনকার সমুদ্রের জলে নুনের ভাগটা মেপে রাখে নি! তাহলে তো এখনকার সমুদ্রের জলে নুনের পরিমাণটা বের করলেই বোঝা যেতো, প্রতিবছর কি হারে সাগরজলে নুনের ভাগ বেড়েছে।

সমুদ্রের জলকে নোনতা করায় নদীগুলির ভূমিকা সত্যিই কতটা রয়েছে সেটা বরং দেখা যাক্। গোটা পৃথিবীর সমস্ত নদী বছরে যে জল বয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে তার পরিমাণ কমবেশী ৩৭,০০০ ঘন-কিলোমিটার। সাগরের উপর যদি নদীর এই জল বিছিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে তা ১০ সেন্টিমিটার পুরু একটা স্তর তৈরি করবে। সেদিক থেকে দেখলে, সমস্ত সাগর মহাসাগরে যে পরিমাণ জল রয়েছে—তা বয়ে আনতে পৃথিবীর সমস্ত নদীগুলির সময় লাগছে ৩,০০০ বছর। অর্থাৎ প্রতি ৩,০০০ বছর অন্তর সাগর জলে নুনের ভাগ বেশ খানিকটা করে বাড়া উচিত; এবং সেদিক থেকে কোটি কোটি বছর আগের তুলনায় এখনকার সমুদ্রের জল অন্ততঃ কয়েক হাজার গুণ বেশী নোনতা হওয়ার কথা। কার্যতঃ তা অবশ্য হয় নি।

প্রায় শ'দুয়েক বছর আগে সমুদ্রের জলকে ফুটিয়ে তা থেকে রাসায়নিক নুনগুলিকে আলাদা করার চেষ্টা যিনি প্রথম করেছিলেন তাঁর নাম অ্যান্টনি লরেন্ট ল্যাঁভয়সিয়ের। তিনি সাগরের জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর সোডিয়ামের নানান ধরনের নুনের খোঁজ পান। ল্যাবরেটরীতে বসে সাগর জলের রসায়ন নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে ল্যাঁভয়সিয়ের টের পেয়েছিলেন, সমুদ্রের জলে মিশে থাকা নানা ধরনের খনিজ নুনের পরিমাণ আলাদা আলাদা করে বের করা অসম্ভব কারণ জলের মধ্যে নিরন্তর ওদের রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে চলেছে।

ল্যাঁভয়সিয়েরের পর গত শতাব্দীর মাঝামাঝি রসায়নবিদ 'জন মারে' বললেন, সাগরজলে রাসায়নিক নুনের বদলে বিভিন্ন মৌলের পরিমাণটা হিসেব করে বের করা হোক; অর্থাৎ, খাবার নুন সোডিয়াম ক্লোরাইডের বদলে সমুদ্রের জলে সোডিয়াম আর ক্লোরিন কতটা রয়েছে, সময়ের ব্যবধানে তার হিসেবে কোনও হেরফের হচ্ছে কিনা, সেটা জানতে পারলেই বোঝা যাবে—প্রাগৈতিহাসিক কালের তুলনায় এখনকার সমুদ্রে নুন-এর ভাগ সত্যিই বেড়েছে কিনা।

মহাসাগরগুলি সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ জাহাজ 'চ্যালেঞ্জার' সমুদ্রের মোট ৭৭টি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে নমুনা জল সংগ্রহ করে, তা বিশ্লেষণ করে রসায়নবিদ্ ডট্‌লার দেখেছিলেন—প্রতি লিটার সাগর জলে নানাজাতীয় নুনের পরিমাণ হলো কমবেশী ৩৫ গ্রাম। দেখা গেলো, সমুদ্রে সেইসময় সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি যে আটটি মৌলের সন্ধান মিলেছিলো, আয়নিত অবস্থায় তাদের পরিমাণের বিশেষ হেরফের হয় না। চ্যালেঞ্জার-এর পৃথিবী পরিক্রমার পর সমুদ্রে এযাবৎ আরো অন্ততঃ ৬৫টি মৌল-আয়নের সন্ধান মিলেছে—যার মধ্যে অন্ততঃ ১৩টি মৌল পৃথিবীর মহাদেশগুলিতেও রীতিমতো দুষ্প্রাপ্য। এর মধ্যে সিলিকন-৩২ মৌলটি তো পাওয়া গেছে একমাত্র একধরনের সামুদ্রিক স্পঞ্জের শরীরে। সবচেয়ে বড় কথা, গত কুড়ি কোটি বছরে সমুদ্র জলে বিভিন্ন মৌল-আয়নের

সামগ্রিক পরিমাণের বিশেষ হেরফের ঘটে নি। অর্থাৎ, নদীগুলি প্রতিনিয়ত নুন এনে সাগর জলে জমা দিলেও সামুদ্রিক নুনের মোট পরিমাণের বিশেষ কোনও হেরফের ঘটছে না। কিন্তু এর কারণটা কি ?

সাগরের তলায় মাটির নিচের চাপ ও তাপের ফলে খুব ধীরে ধীরে মাটি ফুঁড়ে সমানে উঠে আসছে গলন্ত 'ব্যাসাল্ট' পাথরের টুকরো। সমুদ্রতল জরিপ করে দেখা গেছে, সাগরের তলায় যে অজস্র ফাটল ধরে ঐ ব্যাসাল্ট উঠে আসে, সেগুলিকে পরপর সাজালে দৈর্ঘে তা দাঁড়াবে ৬৫,০০০ কিলোমিটার। এই ফাটলগুলো এলো কোথেকে ? আগেই আমরা শুনেছি, পৃথিবীর তাবৎ জল এবং স্থলভাগ চাপানো আছে কতকগুলি 'প্লেট' বা চাকতির উপর। একটা চাকতি যেখানে অন্য একটা চাকতিকে ছুঁয়েছিলো, ফাটল তৈরী হয়েছে সেই রেখা বরাবর। অনেকের আবার ধারণা, ফাটল দিয়ে উঠে আসা ব্যাসাল্টের ধাক্কাতেই চাকতিগুলি একে অপরের কাছ থেকে সরে যেতে থাকে।

মহাসমুদ্রের তলার ফাটল দিয়ে ব্যাসল্ট উঠে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসে 'জুভেনাইল' বা 'কমবয়েসী' জল। আসলে বহুকাল আগে কোনও সময়ে সাগরের তলা থেকে চুঁইয়ে এ জল হাজির হয়েছিলো ব্যাসাল্টীয় অঞ্চলে। ব্যাসাল্টের সঙ্গে ঐ নতুন জল সাগরজলের উপরে উঠে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসে নানা ধরনের যৌগ—যার মধ্যে থাকে বিভিন্ন যৌগ—যেমন, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরিন, ব্রোমিন, কার্বন ইত্যাদি।

'ক্লোরিন' সাধারণতঃ আয়নিত অবস্থাতেই থাকতে ভালবাসে, আর সেই ক্লোরিন আয়ন আবার 'জুভেনাইল' জলের থেকে হাইড্রোজেনকে খুঁজে নিয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চেহারা নেয়। মাটির তলা থেকে 'জুভেনাইল' জল যখন সাগরজলে এসে মেশে তখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে সোডিয়ামের বিক্রিয়ার ফলে তৈরী হয় 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' বা খাবার নুন। এই একই ভাবে তৈরি হয় পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়ামঘটিত সাগরের যাবতীয় নুন। এদিকে পৃথিবীকে ধরে থাকা প্লেট বা চাকতিগুলো যেহেতু সরে যাচ্ছে একে অপরের কাছ থেকে, তার সাথে সাথে সাগরের নিচের মাটি বা লিথোস্ফিয়ার উপকূলভাগের দিকে সরে আসার সময় তাতে বাদ সাধছে মহাদেশগুলোর সীমানা।

সাগর তলের লিথোস্ফিয়ার যখন শক্ত পাথুরে ডাঙ্গাকে ঠেলে সরাতে পারে না তখন সাগর আর ডাঙ্গাজমির সীমানা বরাবর তৈরী হয় প্রকাণ্ড খাত। এই খাত বরাবর সাগরতলের ব্যাসাল্ট এবং অন্যান্য মাটি-পাথর মহাদেশের তলায় জমা হতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে মাটির নিচের চাপে-তাপে ব্যাসাল্ট গলে যায়—সেই ব্যাসাল্টই আবার সাগর তলের মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে; সঙ্গে নিয়ে আসে ক্লোরিন সমৃদ্ধ সেই জুভেনাইল জল। তারপর...সেই একই পদ্ধতি ! অব্যাহত থাকে মহাসাগরের নুনের যোগান।

সৃষ্টির গোড়ায় মহাসাগরে বয়ে আসা নদীজলে নানাজাতীয় নুন এবং সাগর-জলের নুন-এর মধ্যে পরিমাণগত তফাৎ ছিলো সামান্যই। এরপর কোটি কোটি বছরে মহাদেশগুলির খনিজ উপাদানে বিরাট পরিবর্তনের ফলে নুনের উপাদানের দিক থেকে নদী-জলের সাথে সাগর জলের এখন বিরাট ফারাক। দেখা গেছে, সমুদ্রের জলে সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড-এর পরিমাণ নদীর তুলনায় অন্ততঃ ১৭ গুণ বেশী। এটারই ঠিক উল্টোটা ঘটেছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনাপাথরের ক্ষেত্রে। সমুদ্রের জলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর পরিমাণ যেখানে শতকরা ০·৩ ভাগ, নদীর জলে তার পরিমাণ শতকরা ৬০·১ ভাগ, অর্থাৎ সাগরের তুলনায় ২০০ গুণ বেশী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নদীগুলি সাগরে সবচেয়ে কম বয়ে আনে ক্লোরাইড জাতীয় নুন এবং সবচেয়ে বেশী বয়ে আনে ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

নদীর জলে বয়ে আসা বিপুল পরিমাণ ক্যালসিয়াম

তাহলে যায় কোথায় ? ব্যাপারটা হলো, সমুদ্র মহাদেশগুলি থেকে অসংখ্য নদী মারফৎ নানান ধরনের নুন যে পরিমাণে নেয় তার অনেকটাই আবার ফিরিয়ে দেয় মহাদেশকে। সমুদ্র যখন হানা দেয় ডাঙ্গাজমিতে, মহাদেশে প্লাবন আনে—সেইসময় সাগর জলে মিশে থাকা নুনগুলো থিতিয়ে পড়ে মাটির বুকে। এভাবেই খনিজ নুনের ভাঁড়ারগুলি গড়ে উঠেছে মহাদেশগুলির জায়গায় জায়গায়। তাছাড়া ক্যালসিয়াম আর সিলিকনের যৌগ-গুলোকে সামুদ্রিক প্রাণীরা প্রচন্ড ভাবে শুষে নেয়, তাদের হাড়-গোড় আর খোলস তৈরীর তাগিদে।

শুধু তাই নয়, শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং সিলিকণ জমে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীদের মৃত্যুর পর তাদের কংকাল এবং খোলস সাগরজলে মিশে যায় এবং তার বড় অংশই আবার অন্য প্রাণীদের প্রয়োজনে লাগে। বাকী যেটুকু থাকে তা ডুবতে ডুবতে একসময় গিয়ে সাগরতলে থিতিয়ে পড়ে।

খাবার-নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে একটু অন্যরকম। সমুদ্রের জলকণা বাষ্প হয়ে মহাদেশ-গুলির দিকে ছুটে যাওয়ার সময় সংগে করে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড বয়ে নিয়ে যায়। এই নুন-এর কিছুটা অংশ নদীর জলের সাথে আবার সমুদ্রে ফিরে আসে, আর বাকীটা জমা পড়ে ডাংগাজমির মাটিতে। সমুদ্র আর ডাংগাজমির মধ্যে নুনের এই নিয়মিত আদান প্রদানের ফলেই সাগরজলে নুনের সমতা বজায় রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

আগেই বলেছি, প্রতি লিটার সাগরজলে নানা ধরনের নুনের পরিমাণ প্রায় ৩৫ গ্রাম। এর মধ্যে ২৭·২ গ্রাম হলো খাবার নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড; ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ৩·৮ গ্রাম; ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ১·৭ গ্রাম এবং ক্যালসিয়াম সালফেট ১·৩ গ্রাম। প্রতি লিটার সাগর জলে পটাসিয়াম সালফেট এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেট-এর পরিমাণ ১ গ্রামেরও কম।

বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী— সাগর জলের প্রতি ১০ লক্ষ অণুতে কমবেশী ৩৩ থেকে ৩৫টা সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু রয়েছে। এই পরিমাণটা প্রায় সব মহাসাগরের জলেই সমান—প্রশান্ত, অতলান্তিক বা ভারত মহাসাগর, যেখান থেকেই জলের নমুনা নেওয়া হোক না কেন। অবশ্য যেখানে সাগরের জল চারপাশের স্থলভাগের মধ্যে আটকা পড়েছে সেখানে বেশী পরিমাণে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উবে যায় বলে সেই জলে নুনের পরিমাণ পাঁচ-সাত গুণ বেশী হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে 'ডেড-সী'। এই ছোট্ট সমুদ্রটা রয়েছে জর্ডন আর ইস্রায়েলের ঠিক সীমানায়। এখানে নুনের ভাগ সাধারণ সমুদ্রের তুলনায় দশ-বারো গুণ বেশী। ঐ সমুদ্রে জল খুব বেশী নোনতা বলেই, কোনও প্রাণীই এখানে বাঁচতে পারে না।

পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোয় মোট কী পরিমাণ নুন মজুত রয়েছে, তার হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি হাজার ঘন মিটার সমুদ্রজলে সোডিয়াম ক্লোরাইড-এর পরিমাণ ১·৩ টন; অর্থাৎ সমুদ্রের ভাঁড়ারে রয়েছে মোট ৩৮০০ কোটি টন খাবার-নুন। পৃথিবীর মানুষের প্রত্যেকের জন্য বছরে এখন গড়ে ৮ কিলোগ্রাম নুনের প্রয়োজন রয়েছে। সেদিক থেকে মানুষের পাতে নুন পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সাগর-মহাসাগর আমাদের আগামী ১৭০০ কোটি বছরের জন্য নিশ্চিন্ত করেছে।

নয়

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" অপরূপ এই শ্লোকের অর্থ অনুযায়ী তাবৎ প্রাণীজগতের কাছ থেকে মহাসমুদ্রই পেতে পারে স্বর্গের চেয়েও বড়-র দুর্লভ সম্মান এবং শ্রদ্ধা। কারণ সে-ই আমাদের সব্বার আদি জননী, আশ্রয়দাত্রীও বটে।

আজ থেকে ৩২০ কোটি বছর আগে যেদিন পৃথিবীর বুকে জেগেছিলো প্রথম প্রাণ সৃষ্টির তুমুল উন্মাদনা, বিস্ময়ে-আনন্দে-গর্বে নবীন ধরিত্রী কেঁপেছিলো থরথর করে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটেছিলো সাগরেই—তার অসীম অতল জলরাশির গভীরে।

আদিম পৃথিবীর বাতাস, সাগরের নোনা জল আর সূর্যালোক হাতে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর বুকে সেই যে বয়ে নিয়ে এসেছিলো প্রাণ, তারপর এই কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতির গবেষণাগারে চলেছে সেই প্রাণেরই নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হয়েছে রূপবদল। বিবর্তনের ধারা বেয়ে এসেছে ভাইরাস-ব্যাকটিরিয়া থেকে বিশাল বনস্পতি, এককোষী অ্যামিবা থেকে আজকের আমরা—প্রকৃতির সবসেরা সৃষ্টি, মানুষ। মহাসাগরের বুকে কেমন করে প্রাণের রূপ বদলালো, কেমন করে সাগর থেকে প্রাণ উঠে এলো ডাঙগায়, পাখা মেললো আকাশে, সে এক বিচিত্র কাহিনী।

এখন থেকে ৩০০ কোটি বছরেরও আগে যে পৃথিবীতে প্রথম জীবের জন্ম হয়েছিলো তার প্রমাণ রয়েছে অনু-জীবাশ্মে—যাদের মাপ সাকুল্যে এক মিলিমিটারের একশো ভাগের এক-দু'ভাগ। ঐসব ক্ষুদে জীবাশ্মের সন্ধান মিলেছে হ্রদ আর সমুদ্রের তলায় পাললিক শিলাস্তরে। ওগুলো আসলে এক-কোষী ব্যাকটেরিয়াদের জীবাশ্ম; রেডিও-কার্বন পরীক্ষায় ওদের বয়স ধরা পড়েছে—২০০ কোটি বছর।

প্রাণের শুরু এরও ১০০ কোটি বছর আগে। হাজার হাজার বছরের বর্ষার জলে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোর তখন টইটম্বুর অবস্থা! সাগরের জল তখন বেশ গরম, চারপাশের বায়ুমণ্ডল বেশ পাতলা। জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া আর মিথেন-এ ভরা যে হাল্কা বাতাসের মধ্যে দিয়ে সূর্যের অতিবেগুনী আলো এসে পড়ছে ডাঙগাজমির মাটি আর সাগরের জলে। পৃথিবীর উপরে মেঘ জমে রয়েছে তখনো; সে মেঘরাশি তখন মুহুর্মুহুঃ বাজ হানছে পৃথিবীর বুকে—তার অথৈ সাগর জলে।

সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণ, বিদ্যুতের ঝলসানি, ডাঙগাজমিতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, মহাজাগতিক রশ্মির আনাগোনা, সব মিলিয়ে পৃথিবীর চারপাশের সেই অদ্ভুত পরিবেশে বাতাসের হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া আর মিথেন মিলে তৈরী হলো কতকগুলো রাসায়নিক জৈব যৌগ। ঐসব জৈবযৌগের অণুগুলো একটু

ভারী হতেই বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়লো সাগরের জলে এবং সেখানেই ভাসতে লাগলো তা।

রাসায়নিক জৈব যৌগ বলতে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, আর নিউক্লিক অ্যাসিড; অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই প্রোটিন অণুর জন্ম। নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন অ্যামাইনো অ্যাসিডের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। নিউক্লিক অ্যাসিড দু'রকমের; রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড—সংক্ষেপে আর-এন-এ, আর ডি-অক্সি রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড—চলতি কথায় ডি-এন-এ। ডি-এন-এ'র বৈশিষ্ট্য —এরা নিজেদের মতো হুবহু একরকম অণু বানাতে পারে। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, এরাই দুনিয়ার তাবৎ জীবের বংশ-গতির ধারক-বাহক।

আদিম সমুদ্রের জলে জৈব-যৌগের অণুগুলি ভাসতে ভাসতে জুড়ে যেতে লাগলো পরস্পরের সঙ্গে; জৈব অণুদের মিশেলে যেন জন্ম নিলো এক ফোঁটা জল। সাগরের জল থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখবার জন্য সেই জলের ফোঁটার মধ্যেকার জৈব অণুগুলি নিজেদের চারপাশে গড়ে নিলো একটা পর্দার ছাউনী। জন্মালো পৃথিবীর প্রথম জীবকোষ।

সেই ৩০০ কোটি বছরেরও আগের সমুদ্রের জলে ধাতব নুন আর কার্বন-যৌগের অভাব ছিলো না। সাগরের বুকে জীবকোষেরা সেগুলো খেয়ে দিব্যি বেঁচে রইলো কোটি কোটি বছর। জীবকোষদের বংশবিস্তারও চললো সমানতালে; কোষের মধ্যেকার ডি-এন-এ অনুরূপ কোষের জন্ম দেয়। তবু মাঝে মাঝে ডি-এন-এ আর প্রোটিনের মিশেলে হেরফের হলেই জীব-কোষের রূপ পাল্টায়; চালু হয় প্রাণের নতুন ধারা।

কোটি কোটি বছরে জীবকোষের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ালো যখন কোষেদের মধ্যে খাবার নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। একদল কোষ তখন বাইরের খাবারের উপর আর ভরসা না রেখে নিজেদের শরীরের ভেতরেই খাবার তৈরীর ব্যবস্থা করে নিতে তৈরী হলো। সূর্যের আলোর সাহায্যে তারা জল আর কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অণুগুলোকে একসাথে মিশিয়ে নিয়ে তৈরি করলো গ্লুকোজ বা শর্করার অণু। এতে বাড়তি লাভ হিসেবে পাওয়া গেলো খানিকটা অক্সিজেন।

আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সেই অক্সিজেন জমা হতে থাকলো একটু একটু করে। বাতাসে অক্সিজেন জমে জমে সূর্য থেকে অতিবেগুনী রশ্মি আসার পথটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেলো; ফলে, সমুদ্রে নতুন প্রাণ তৈরীর কাজটাও গেলো বন্ধ হয়ে। অবশ্য ততদিনে প্রাণের রূপ বদল ঘটে গেছে অনেকটাই;

আজ থেকে ২০ কোটি বছর আগে ট্রায়াসিক যুগে বেশ কিছু সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ডাঙ্গা থেকে সাগরে ফিরে গিয়েছিলো। এদের একটা হলো 'ইথিওসর' (ছবিতে বাঁ-দিকে)—যার সাথে আজকের শুশুক বা ডলফিনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। সাত-আট মিটার লম্বা 'টাইলোসরাস' (ছবিতে ডান-দিকে) সমুদ্রে রাজত্ব করেছে এখন থেকে ৬ কোটি বছর আগে। ডাঙ্গার ডাইনোসরদের সাথে এদের তুলনা করা চলে।

ব্যাকটেরিয়া থেকে এসেছে সবুজ শ্যাওলা। পৃথিবীতে দুটো নির্দিষ্ট ধারায় প্রাণের বিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। একদল জীবকোষ—সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে—সূর্যের আলোয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড আর জল থেকে নিজেদের খাবার তৈরীর কায়দাটা রপ্ত করে নিয়েছে; এরাই আজকের গাছপালার পূর্বসূরী। ওদিকে দ্বিতীয় দলের প্রাণীরা বাঁচতে লাগলো পরের তৈরী খাবার খেয়ে। সেদিনের সেই পরজীবী ব্যাকটেরিয়াদেরও রূপবদল ঘটতে থাকলো ক্রমাগতঃ।

আজকের দিনেও আর এক জাতের জলের জীব দেখা যায়—যারা হলো আধা-প্রাণী, আধা গাছ। এইসব ক্ষুদে জীবের কোনটার নাম 'ইউগ্লিনা' কোনটার নাম 'ভলভক্স'। প্রাণীদের মতো ছট্‌পট্‌ করে ঘুরে বেড়ালেও,—এদের শরীরে ক্লোরোফিল রয়েছে এবং তার সাহায্যে সময়ে সময়ে নিজেদের খাবারও বানিয়ে নেয় এরা। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'প্রোতিস্তা'।

ডাঙ্গা থেকে যেসব স্তন্যপায়ী সমুদ্রে ফিরে গিয়েছিলো, তিমি তাদের অন্যতম। নানান জাতের তিমি দেখা যায় সাগর মহাসাগরে। 'রাইট তিমি' (উপরে) লম্বায় ১৮ মিটার—এদের এখন আর বিশেষ দেখা মেলে না। 'ফিনার তিমি' (নীচে) লম্বায় ২৪ মিটার—এরা অনেকটা হিংস্র স্বভাবের।

পাথরের খাঁজে এদের যে অণুজীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার বয়স ১২০ কোটি বছর।

'প্রোতিস্তা' থেকেই এলো পরের ধাপের উঁচু প্রাণী—স্পঞ্জ। স্পঞ্জের কোষগুলো জোট বেঁধে থাকলেও এরা প্রত্যেকে স্বাধীন; ইচ্ছে করলে দল ছেড়ে ভাসতে পারে এদিক ওদিক।

একসময় ঐ কোষের দল নিজেদের চারপাশে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চুণের দেওয়াল গড়ে নিলো—আত্মরক্ষার জন্য। ব্যস! অমনি কোষগুলিরও ইচ্ছেমতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানোয় ইতি!

নতুন এই প্রাণী হলো জেলি-মাছ, মেডুসা। এদের দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের মতোই; যেন একটা তালশাঁস আর তার থেকে বেরিয়েছে কতকগুলো শুঁড়।

এদেরই ঠিক গায়ের ধাপে এলো সাগর-কুসুম বা সী-অ্যানিমোন জাতের প্রাণীরা। সাগরের তলায় এরা ফুটে থাকে ঠিক ফুলের মতো। রং-বেরঙের এই সব ফুলগুলো ডালপালা ছড়ায়, ঠিক যেন ফুলের ঝাড়! এদের এক জাতভাই হলো প্রবালকীট, যাদের খোলসে জমে জমে তৈরি হয় প্রবাল-দ্বীপ। সমুদ্রে এইসব প্রাণীদের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিলো এখন থেকে ৬৫ কোটি বছর আগে, প্রাক-কেম্‌ব্রিয়ান যুগে।

প্রবালকীটের পর প্রাণের রূপ বদলালো, এলো কৃমি। হাবভাবের দিক থেকে জেলি-মাছের সংগে মিল থাকলেও এদের শরীরে দেখা দিলো সূক্ষ্ম স্নায়ুর জাল; শরীরের সামনের দিকটায় চোখের মতো ছোট ছোট বিন্দু, সেখানে আলো পড়লেই কৃমিদের শরীরে সাড়া জাগে।

ঐ কৃমিরই একদল আবার চেহারা পাল্টে হলো কেঁচো-জোঁক জাতের প্রাণী। জন্মালো বহু পা-ওয়ালা 'ব্র্যাকিওপড'রা—এখনও তাদের দেখা মেলে জাপানের সমুদ্র-অঞ্চলে। এই ব্র্যাকিওপড থেকেই এসেছে ঝিনুক, শামুক, শাঁখ-শুক্তির দল। এ-সবই ৫০-৫৫ কোটি বছর আগের সেই কেম্‌ব্রিয়ান যুগের কথা।

৪২ কোটি বছর আগে সিলুরিয়ান যুগের গোড়ায় ফিরে গেলে দেখা যাবে—শান্ত আবহাওয়ায় প্রাণের মেলা বসেছে সমুদ্রের জলে। একদিকে নানা ধরনের শ্যাওলা আর সামুদ্রিক লতার ভীড়; অন্যদিকে স্পঞ্জ, জেলিফিস, তারামাছ, শামুক-ঝিনুকের বিচিত্র সহাবস্থান। অথচ, ডাঙগাগুলো কিন্তু ধু-ধু ফাঁকা; প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও! সেখানে তখন আগ্নেয়গিরির ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাতে লাভা আর ছাই-ভস্ম জড়ো হচ্ছে।

ঐ সিলুরিয়ান যুগেই জলের জীব প্রথম ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে আসে। যতদূর জানা গেছে, সাগরজলের সাথে যেসব শ্যাওলারা এসে ডাঙগায় আছড়ে পড়তো, প্রায় ৪২ কোটি বছর আগে তারাই প্রথম ভিজে স্যাঁতসেতে ডাঙগাজমিতে নিজেদের মানিয়ে নেয়। পরবর্তীকালে ঐসব শ্যাওলাদের থেকেই জন্মালো 'সিলপ্সিড' জাতীয় নীচুস্তরের উদ্ভিদ; এদের মধ্যে আজও টিঁকে রয়েছে 'ক্লাব-মস্' আর 'হর্স-টেইল'।

ক্রমে এলো নতুন জাতের উদ্ভিদ যারা মাটির নিচে শেকড় চালিয়ে প্রয়োজনীয় জল টেনে আনতে শিখলো, সেই জল আর বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সূর্যের আলোয় রান্না করে নিজেদের পুষ্টির ব্যবস্থা করলো। ডাঙ্গা জমিগুলি তখন আস্তে আস্তে ছেয়ে গেলো ঐসব গাছপালায় আর তাই দেখে বুঝি খানিকটা ভরসা পেয়েই এবার ডাঙ্গায় উঠে এলো বহু-পা ওয়ালা কেন্নো আর কাঁকড়া-বিছের দল। জলজ প্রাণীর ডাঙ্গায় উঠে আসার রীতি চালু হলো, সেই সঙ্গে শুরু হলো ডাঙ্গার প্রাণীদেরও রূপবদল।

আদি-মাছেরা পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলো ৫০ কোটি বছর আগে; অবশ্য পুরোপুরি মাছ তারা নয়। দেখতে অনেকটা মাছের মতো হলেও মুখে তাদের চোয়াল ছিলো না, গায়ে ছিলো না জোড়া-পাখনা, পিঠে ছিলো না লম্বা কাঁটা বা মেরুদণ্ড। আদি মাছেদের গা-মাথা সব শক্ত হাড়ের পাত দিয়ে মোড়া। এদের নাম 'অস্ট্রাকোডার্ম', লম্বায় ৩০ সেন্টিমিটারের বেশী নয়।
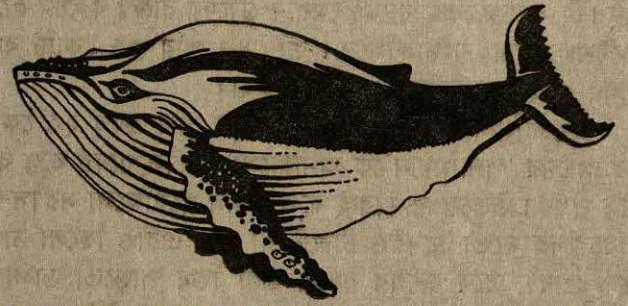
পিঠে কুঁজওয়ালা তিমি। লম্বায় ১৫ মিটার। এদের এক একটার শরীর থেকে ৬০ ব্যারেল চর্বিজাত তেল মেলে।

সত্যিকারের মাছ জন্মালো এদের থেকে দশকোটি বছর পরে, ডেভোনিয়ান যুগে। জলে-স্থলে—গোটা দুনিয়ায় তখন মাছেদেরই রাজত্ব। হাড়ের চোয়াল, শক্ত মেরুদণ্ড আর জোড়া-পাখনা তখন গজিয়ে গেছে মাছেদের শরীরে। বিচিত্র তাদের আকার-ভঙ্গী। কোনটা একেবারেই ক্ষুদে, কোনটা বা ৬-৭ মিটার লম্বা! ওদেরই একদল আবার শক্ত হাড় খুইয়ে পেলো কার্টিলেজ বা তরুণাস্থির কাঠামো, এলো হাঙর, শংকর মাছদের আদিরূপ। অন্যদিকে আর একদল মাছের শরীরে পাখনার বদলে গজালো পায়ের মতো মাংসল প্রত্যঙ্গ, যার উপর ভর দিয়ে এরা ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে যেতে পারতো। ডাঙ্গায় ওঠার পর এইসব মাছেদেরই শরীরে তৈরী হলো ফুসফুস, এলো আদিম উভচর।

উভচর প্রাণীর সবচেয়ে পুরনো যে নমুনাটির জীবাশ্ম মিলেছে বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন—'ইকথায়োস্টেগা'। চেহারাটা এর খানিকটা মাছ আর খানিকটা ব্যাঙের মতো। এদের গায়ে মাছের মতো আঁশ ছিলো; ছিলো ল্যাজের উপর পাখনা। এদিকে শরীরের দু'পাশে মাছের পাখনার বদলে ছিলো ব্যাঙের মতো দু'জোড়া পা। 'ইকথায়োস্টেগা'দের ল্যাজের পাখনা উঠে যেতেই ওরা হয়ে গেলো পুরোপুরি

ব্যাঙ্। ঐ ব্যাঙেদের মাধ্যমেই মেরুদণ্ডীদের রাজত্ব কায়েম হলো মহাদেশগুলোর ডাঙ্গাজমিতে। তা সেও প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগের সেই ডেভোনিয়ান যুগের কথা।

ডেভোনিয়ানকে যদি মাছেদের যুগ বলি, তবে ২৫ কোটি বছর আগের 'পারমিয়ান'কে অনায়াসেই সরীসৃপদের যুগ বলা যেতে পারে। উভচর প্রাণীরাই রূপ বদলে হয়েছিলো সরীসৃপ। উভয়চরদের মতো এদেরও চারটে পা এবং এরাও ছিলো ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী, তবে জলের বদলে এরা ডিম পাড়তো ডাঙ্গায়। কয়েক কোটি বছরে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এরা অনেকটাই বাড়লো। রূপ পাল্টে এরাই একদিন হলো দৈত্যাকৃতি ডাইনোসরের দল। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ওরা রাজত্ব চালালো প্রায় ১৪ কোটি বছর ধরে। ডাইনোসরদের যেসব প্রজাতি ঘোরাফেরার জন্যে ডাঙ্গার বদলে সমুদ্রকে বেছে নিয়েছিলো, তাদের মধ্যে রয়েছে প্লেজিওসরাস, ইকথাইওসরাস, প্লাইওসরাস ইত্যাদিরা।

ডাইনোসরদের আধিপত্য ছিলো সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে, ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষ পর্যন্ত। সম্ভবত ঐ সময়েই এক বড়োবসো পরিবর্তন আসে পৃথিবীর আবহাওয়ায়। শীতের ঠাণ্ডাটা হঠাৎ করেই যেন অনেকটা বেড়ে গেলো। ছোট ছোট সরীসৃপ যেমন কুমীর, টিকটিকি গিরগিটি, কচ্ছপ—সেই শীতের হাত থেকে নিজেদের কোনরকমে বাঁচাতে পারলেও, বিশাল-বপু ডাইনোসররা ঝাড়ে বংশে লোপাট হয়ে গেল দুনিয়া থেকে, চিরতরে।
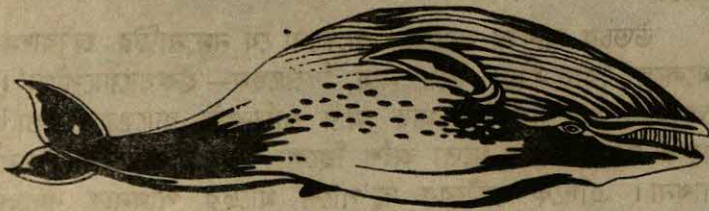
নীল তিমি, লম্বায় ৩০ মিটার। পৃথিবীতে কোন সময়েই এর চেয়ে বড় প্রাণী বিচরণ করে নি। শিকারীদের দৌরাত্ম্যে এদের সংখ্যা দ্রুত কমছে।

শুশুক বা ডলফিন—এককালে ছিলো ডাঙ্গার স্তন্যপায়ী, আজ সাগরের জীব।

ডাইনোসরেরা লোপাট হওয়ার ঢের আগেই অবশ্য স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটেছে ডাঙ্গায়। পাঁচ কোটি বছর আগে এই স্তন্যপায়ীদেরই একদল আবার খাবারের খোঁজে পা বাড়িয়েছিলো সমুদ্রে; তারা আর ফিরে আসেনি। আজকের তিমি, ডলফিনেরা ওদেরই উত্তরসূরী।

সমুদ্রে প্রাণের রূপ বদলের ধারা এভাবে চলে এসেছে কোটি কোটি বছর ধরে। মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর যে চেহারা আজ আমরা দেখছি তা কয়েক লক্ষ বছরের বেশী পুরনো নয়। তবু সমুদ্রের প্রাগৈতিহাসিক বাসিন্দারা বুঝি সবাই এখনও লোপ পায় নি। অন্ততঃ 'সীলাকান্থ' মাছের সন্ধান পাবার পর বিজ্ঞানীদের তো তাই ধারণা।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। ঘটনাটা ঘটেছিলো ১৯৩৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর। দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে 'চালুম্না' নামে ছোট্ট নদীর মোহানায় এক মাছ ধরা জাহাজের জালে ধরা পড়লো এক আজব মাছ। দৈর্ঘ্যে দেড় মিটার আর ৫৭ কেজি ওজনের সেই মাছটার আঁশগুলো বেশ বড়ো বড়ো, গোল চাকতির মতো; পাখনাগুলো শরীরের সঙ্গে একটা

বোঁটা দিয়ে যুক্ত, যেমন গাছের পাতা আটকে থাকে ডালে! মাছটাকে তোলা হয়েছিলো জলের প্রায় ৭০ মিটার তলা থেকে। জাহাজে তোলার পর মাছটা কয়েক ঘণ্টার বেশী বাঁচে নি।

পণ্ডিতেরা দীর্ঘদিন ধরে মাছটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন, ওটা ১৩ কোটি বছর আগেকার সেই ক্রিটেসিয়াস-যুগের 'সীলাকান্থ'। একথা শুনে চমকে উঠেছিলেন বিজ্ঞানী-দের অনেকেই, কারণ এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিলো যে ঐ ধরনের প্রাগৈতিহাসিক মাছের জ্ঞাতিগুষ্টি সব সাফ হয়ে গেছে এখন থেকে ছ' কোটি বছর আগে টারসিয়ারি যুগের গোড়ায়।

সীলাকান্থ-এর শরীরে একই সঙ্গে মেরুদণ্ডী প্রাণী আর এখনকার মাছের মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। এরা জলে ডিম পাড়ে না, বরং মাছের পেটের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। জলের ২০০ থেকে ৩০০ মিটার গভীরতায় এরা চলে ফিরে বেড়ায়, তবে সাঁতরানোর ক্ষমতা এদের নেই বললেই চলে। সাধারণতঃ, জলের তলায় পাথরের খাঁজে এরা ঘাপটি মেরে শিকারের আশায় বসে থাকে।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত অন্ততঃ ৮০টি সীলাকান্থ ধরা পড়েছে প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগরে, এমনকি আমাদের ভারতের উপকূলেও। তবে বড় আফসোসের কথা, ধরার পর বাঁচিয়ে রাখা যায় নি ঐ প্রাগৈতিহাসিক মাছেদের একটাকেও।

দশ
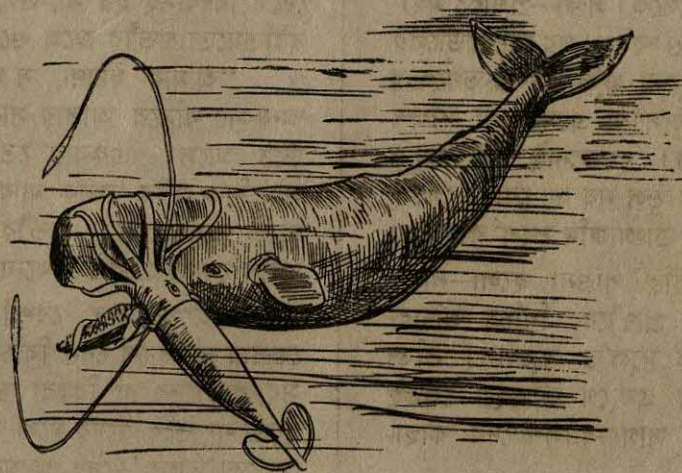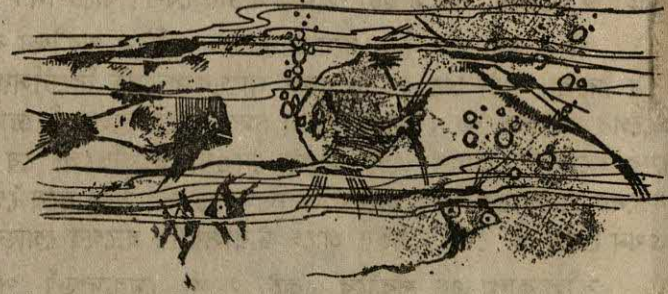
১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল। গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো 'কন্‌টিকি'-নামে বড়োসড়ো এক ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছেন থর হেয়েরডাল আর তাঁর পাঁচ সঙ্গীসাথী। যাত্রা করেছেন পেরুর কালাও বন্দর থেকে। লক্ষ্য—প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে পলিনেশিয়ার কোনও দ্বীপ। থর হেয়েরডালের দৃঢ় বিশ্বাস, পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলো মূল এশিয়-ভূখণ্ডের কাছাকাছি হলেও ওখানকার আদিবাসীরা এসেছিলো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্রেফ ভেলায় চেপে। সেজন্যেই এই সমুদ্র অভিযান। হেয়েরডালের ধারণাটা যে ভুল নয় তা বোঝা গেলো যাত্রাশুরুর ১০১ দিন পর, যখন ওঁরা ডাঙাজমি স্পর্শ করলেন।

হেয়েরডালের সমুদ্রযাত্রায় উপরি পাওনা হলো—নানাধরনের সামুদ্রিক মাছ আর অন্যান্য প্রাণীদের বিচিত্র আচার-আচরণ খুব কাছ থেকে দেখার এক দুর্লভ সুযোগ। সত্যি বলতে, 'কনটিকি'র যাত্রীদের আগে এযুগে বোধহয় কেউই দিনের পর দিন অমন খোলামেলায় সাগর-বাসিন্দাদের কাছাকাছি থাকেন নি।

হেয়েরডাল তাঁর রোমাঞ্চকর সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"সাধারণতঃ রাত্রের দিকে এবং কখনো সখনো দিনের বেলাতেই ছোট্ট স্কুইডের দল জল থেকে অন্ততঃ ফুট-ছয়েক লাফিয়ে উঠে উড়ুক্কু মাছের মতো বাতাসে ভেসে যেতো। মাঝে মাঝে আমাদের ভেলার উপরও এসে আছড়ে পড়তো দু'একটা। দেখে বিশ্বাসই হয় না, ওগুলো মোটেই উড়ুক্কু মাছ না; বরং রীতিমতো গভীর জলে ওদের বাস!

"আমার ধারণা, সাগরের গভীরে যারা থাকে, রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তারা জলের উপরতলায় উঠে আসে। একবার তো লম্বা লিকলিকে সাপের মতো সামুদ্রিক জীব 'স্নেক ম্যাকরেল' ভেলার উপর ছই-এর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো। গভীর জলের এই বাসিন্দাটিকে আমাদের আগে বোধহয় কেউ কখনো জ্যান্ত অবস্থায় দেখে নি।

"অপেক্ষাকৃত বেশী অন্ধকার রাতগুলোয় আমাদের ভেলার চারপাশে যেন বিচিত্র প্রাণের মেলা বসে যেতো। সেই সব প্রাণীদের রং কিংবা চেহারা আমাদের তেমন একটা ঠাওর হতো না, তবে ওদের মধ্যে অনেকের গা থেকে যে আলো ঠিকরে বেরতো তাতে ওদের অবয়ব আর চলাফেরার ভঙ্গিটি আন্দাজ করতে পারতাম। একবার তো এক সামুদ্রিক প্রাণীর গা থেকে ঠিকরানো আলো দেখে মনে হলো, আমাদের ৪৫ ফুট লম্বা 'কনটিকি'র চেয়েও বুঝি ওটা বড়ো। বলা বাহুল্য, ঐসব

সামুদ্রিক প্রাণীদের নামগোত্র আমাদের অজানা।"......

থর হেয়েরডালের কথাটাই আসলে ঠিক। গত হাজার দুয়েক বছর ধরে সাগরের বুক তোলপাড় করলেও তার বাসিন্দাদের বিশেষ করে যারা সমুদ্রের কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার মিটার নিচে ঘুরে বেড়ায়—তাদের অল্প কয়েকটারই দেখা পাওয়া গেছে এ যাবৎ। গভীর সমুদ্রে অবশ্য খাদ্যের অভাবের জন্যে সামুদ্রিক প্রাণীদের সংখ্যা অগভীর উপকূল এবং সাগরের উপরতলার বাসিন্দাদের তুলনায় অনেক অনেক কম, তবে সমুদ্রে এমন একটুও জায়গা নেই যা প্রাণের বৈচিত্র্যে ভরপুর নয়।

সাগরের জলে ভেসে বেড়ায় লক্ষ কোটি ক্ষুদে জীব, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে যাদের দেখাই যায় না। ওদের কেউ কেউ উদ্ভিদগোত্রীয়—নাম 'ফাইটোপ্ল্যাংকটন'। আবার ওদের সাবাড় করতেই একদল ক্ষুদে প্রাণীর জন্ম, যাদের নাম জু-প্ল্যাংকটন; ওদেরও দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লাগে।

অন্যদিকে, ঐ সমুদ্রেই রয়েছে নীল তিমির মত বিশাল সামুদ্রিক প্রাণী, লম্বায় যারা ৩০ মিটার আর ওজনে ১৫০ টনের চেয়ে বেশী। নীল তিমির দেখা মেলে কুমেরু সাগরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সব ডাইনোসরদের চেয়েও এই সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীটি অন্ততঃ তিনগুণ ভারী!

আবার সাগর-মহাসাগরের বাসিন্দাদের অনেকের সৌন্দর্যেরও বুঝি তুলনা হয় না। এদের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের রুপালী মাছ, গা থেকে যাদের আলো ঠিকরে বেরোয়। রয়েছে সী-অ্যানিমোন বা সাগর কুসুমের মতো প্রাণী—যারা রঙ্-বেরঙের ফুলের রূপ ধরে শিকারের আশায় পড়ে থাকে সাগরের নিচে, বালি-পাথরের খাঁজে।

সমুদ্রের নিরক্ষীয় অঞ্চলে ডালপালা ছড়িয়ে রাখা প্রবালের ঝাঁকদের আকর্ষণও কি কম! সমুদ্রেই দেখা মিলেছে কৃমি জাতীয় এমন কীট-এর লম্বায় যা ২৫ মিটারের চেয়েও বেশী; ডাঙগার সাপেদের চেয়েও কোনও কোনও সামুদ্রিক মাছের বিষের পাল্লা ঢের ভারী!

ডাঙগার মতো সমুদ্রেও জীবনের মূল উৎস—সূর্য। অগভীর জলের ফাইটোপ্ল্যাংকটন, শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদরা তাদের বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় রসদ যোগাড় করে সূর্যের আলো থেকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে ক্ষুদে মাছ আর শামুক জাতীয় প্রাণীরা; এইসব ক্ষুদে প্রাণীরাই আবার বড়ো প্রাণীদের পেট ভরায়।

শিকার ধরা আর আত্মরক্ষার জন্য সাগরের বাসিন্দাদের কলা-কৌশলের যেন অন্ত নেই! ওদের কেউ ধরে ছদ্মবেশ, কেউ নিজের চারপাশে গড়ে নেয় বিদ্যুৎ-বেষ্টনী, কেউ বা পিচ-কিরি দিয়ে রঙ ছোঁড়ার মতো শত্রুর দিকে ছুঁড়ে দেয় কালি। এর মাঝখানেই আবার সঙ্গী খোঁজা, ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটানো, ছানাপোনা মানুষ করা, ঝাঁক বেধে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো—এসবও চলতে থাকে নিয়মমাফিক।

সমুদ্রের জলে যতো প্ল্যাংকটন জাতীয় ক্ষুদে এককোষী জীব ভেসে বেড়ায়, তাদের শতকরা ৬০ ভাগই হলো 'ডায়াটম'। এক ফোঁটা সাগরের জলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সামনে ধরলে তার মধ্যে অগুন্তি ডায়াটমের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বাইরে থেকে এদের দেখতে অনেকটা স্ফটিকের বাক্সের মতো। স্ফটিক-টা আসলে 'সিলিকা', অঢেল মেলে সাগরের বালিতে। ঐসব ক্ষুদে জীবরা নিজেরাই নিজেদের চারপাশে সিলিকা'র দেওয়াল বানিয়ে নেয়। সমুদ্রের জলে মিশে-থাকা পুষ্টিকর সব নুন আর সূর্যের আলো যোগায় এদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদ।

সমুদ্র যখন তোলপাড় হয় তখন সাগরের নিচে জমে থাকা নুনগুলো উঠে আসে উপরে; জীবনধারণের অপর্যাপ্ত রসদ পেয়ে 'ডায়াটম'গুলো যেন হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে ওঠে; ওদের সংখ্যাও বাড়ে হু হু করে। জাহাজে করে যাবার সময় তাই হঠাৎ করেই নজরে আসে—কে যেন দিগন্ত বিস্তৃত রঙীন
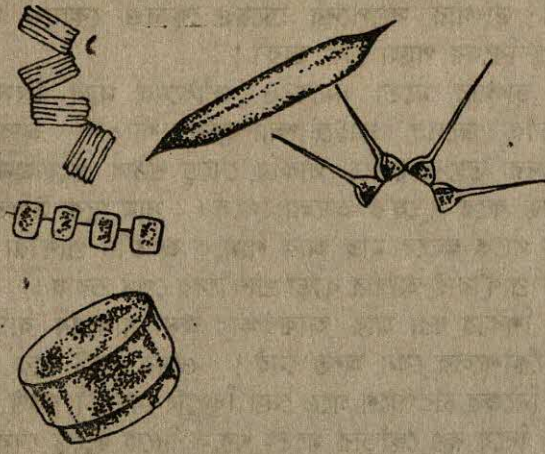
এক-কোষী ডায়াটম। এদের দেখা মেলে হরেক আকারে।

জেলী মাছ। এদের গোটা শরীরটাই স্বচ্ছ।

কার্পেট মেলে দিয়েছে জলের উপর! লক্ষ-কোটি ক্ষুদে জীবের রঙ মিলে মিশে সেখানে সাগরের জলে হলুদ, খয়েরী কিংবা সবুজ আভা এনে দিয়েছে।

ডায়াটমের মতো আর এক ধরনের এককোষী জীব হলো 'ডাইনোফ্লাজেলেট'। এরা আধা-উদ্ভিদ, আধা-প্রাণী। পেট ভরানোর জন্য কখনো সখনো এরা অন্য প্ল্যাংকটনদের সাবাড় করলেও, অধিকাংশ সময়েই ডায়াটমদের মতো নিজেদের খাবার নিজেরাই বানিয়ে নেয়। 'ডাইনোফ্লাজেলেট-দের কেউ কেউ নিজেদের চারপাশে আলো ছড়ায়। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে যখন সমুদ্রের জলে ডায়াটম চিক্‌চিক্‌ করে, আর তারই মাঝে জ্বলজ্বল করে লক্ষ-লক্ষ ডাইনোফ্লাজেলেট, তখন ওদের পাশাপাশি ভেসে বেড়ায় 'কোপপড' নামে অগুন্তি ক্ষুদে প্রাণী। আকারে এরা আলপিনের ডগার চেয়ে বড়ো না হলেও প্ল্যাঙ্কটন-দের সাবাড় করতে এদের জুড়ি নেই। এই 'কোপপড'-রা আবার সার্ডিন জাতীয় ছোট ছোট মাছ থেকে শুরু করে তিমির মতো অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্যের প্রধান যোগানদার।

'জেলিমাছ' আর 'পর্তুগীজ ম্যান-অফ-ওয়ার'-রাও প্ল্যাঙ্কটনদের বড় শত্রু। বিবর্তনের দিক থেকে জেলিমাছ-রা অনেক পিছনে পড়ে থাকলেও এদের শরীরে এক ধরনের বিষাক্ত হুল আছে যার ছোঁয়ায় এরা নিজেদের সমান মাপের আর পাঁচটা প্রাণীকে অচল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

পর্তুগীজ ম্যান-অফ-ওয়ার-এর শারীরিক গঠন ভারি বিচিত্র; এদের শরীর যেন এক একটা কলোনী—যেখানে ঝাঁক বেঁধে থাকে চার দল ক্ষুদে প্রাণী। ওদের প্রথম দলের কাজ হলো—গোটা কলোনীটাকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখা; দ্বিতীয় দলের কাজ শিকার ধরা; তৃতীয় দলের প্রাণীরা শিকারগুলোকে হজম করে গোটা কলোনীটাকে বাঁচিয়ে রাখে আর চতুর্থ দল বংশ বিস্তার করে। চার ধরনের প্রাণীর এমন অদ্ভুত সহাবস্থানের নজির গোটা প্রাণীজগতে আর নেই।

প্ল্যাঙ্কটন এবং অন্যান্য ক্ষুদে প্রাণীরা যে কী অবিশ্বাস্য সংখ্যায় সাগরের জলে ভেসে বেড়ায় তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এক আঁজলা সাগর জলে কয়েক লক্ষ ডায়াটম ভেসে বেড়ানোটা যেমন বিচিত্র নয়, তেমনি প্ল্যাঙ্কটনের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে এমন অসংখ্য ক্ষুদে প্রাণী থিক্‌থিক্‌ করে সাগর জলের ওপরতলায়।

উদাহরণ হিসেবে ক্রীল-এর কথা বলা যায়। কুচো চিংড়ীর মতো দেখতে ইঞ্চি-দুয়েক লম্বা এ সামুদ্রিক প্রাণীটি তিমির অন্যতম প্রধান খাদ্য। মার্কিন সমুদ্রবিজ্ঞানী উইলিস পিকিগ্‌নাট একেবারে হিসেব কষে দেখিয়েছেন, যে সব নীল তিমির বাচ্চা কুমেরু অঞ্চলে শিকারের খোঁজে হানা দেয়, প্রতিদিন তাদের পেট ভরাতে চাই তিন টন করে 'ক্রীল'। ঐসব তিমিগুলো প্রতিবছর মাস ছয়েক সময় কাটায় কুমেরু অঞ্চলে; সেই হিসেবে গড়ে একেকটা তিমি বছরে কমবেশী ৫০০ টন 'ক্রীল' গলাধঃকরণ করে। প্রতি বছর যে সংখ্যায় তিমি কুমেরু অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় তাতে নিদেনপক্ষে ২৭ কোটি টন 'ক্রীল' ওদের পেটে যাওয়ার কথা। মনে রাখতে হবে, মোট যত 'ক্রীল' ঐ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, তার একটা সামান্য অংশই তিমির পেটে যায়। সেদিক থেকে দেখলে—প্রতিবছর শুধু কুমেরু-সাগরেই ভেসে বেড়ায় কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার কোটি টন ক্রীল।

উপকূলের কাছে সমুদ্রের গভীরতা যেখানে ১৫০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে, সেসব অঞ্চলে সূর্যের আলো পৌঁছোয় একেবারে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত। স্বভাবতঃই সাগরের উপরতলার মতো এখানেও অগুন্তি উদ্ভিদ আর সামুদ্রিক প্রাণীর ভিড়! অগভীর উপকূলে, সমুদ্রের নিচুতলায় খাবারের অভাব নেই; উপরতলার মতো প্ল্যাঙ্কটন আর অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ সর্বক্ষণ টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে সাগরের তলায়। ওখানকার প্রাণীদের তাই হাঁ করে বসে থাকলেই পেট ভরে যায়; কষ্ট করে ওদের আর খাবার খুঁজতে বেরোতে হয় না। আসলে জলের তলায় মাটির উপর বা পাথরের খাঁজে জায়গা পাওয়াটাই ঐসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে বিরাট সমস্যা।

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, জলের তলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমিতে 'ব্রিট্‌ল্‌ স্টার' নামে তারামাছের শুধু একটা মাত্র প্রজাতিরই সংখ্যা অন্ততঃ দশ লক্ষ! তারামাছের পাশাপাশি নিশ্চল হয়ে শিকারের আশায় পড়ে থাকে স্পঞ্জ, শামুক, শুক্তি, ঝিনুক, সাগর কুসুম—এইসব হাজারো প্রাণী। ওদের নজর এড়িয়ে যেটুকু খাবারের কণা গিয়ে সাগরের মেঝেতে আটকায় সেগুলির খোঁজে আবার ঘুরে বেড়ায় কেঁচো-কৃমি জাতীয় সামুদ্রিক কীটের দল। সমুদ্রের তলায় কাদামাটির উপর দিয়ে 'সমুদ্র-শশা' শুঁড় বাড়িয়ে এদিক-ওদিকে খাবারের খোঁজে যখন এগিয়ে চলে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।
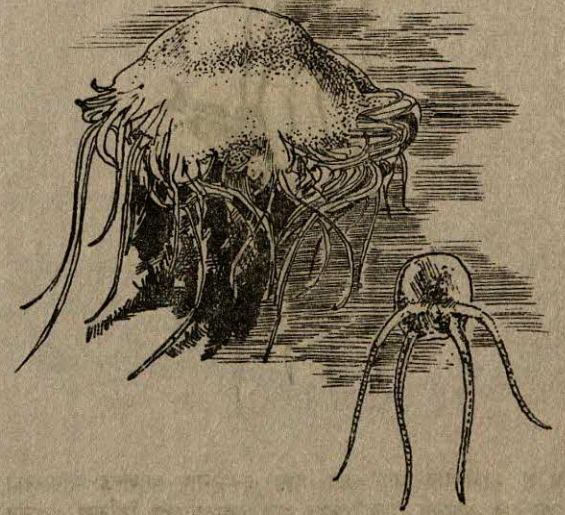
'সায়ানিয়া ক্যাপিলাটা'—এক ধরনের জেলী মাছ। শুঁড়গুলো সরে গিয়ে জেলী মাছের মুখগহ্বর দেখা যাচ্ছে। ক্ষুদে এবং স্বচ্ছ জেলী মাছকে (ছবিতে ডান দিকে) অনেক সময় কাছ থেকেও ঠাওর করা যায় না।

সামুদ্রিক প্রাণীদের শেষ দলটাকে দেখতে পাওয়া যায় খোলা সমুদ্রে। এরা হলো সার্ডিন, টুনা, ম্যাকরেল থেকে শুরু করে হাঙর পর্যন্ত হরেক জাতের মাছ; সাপ, কচ্ছপ, আর সেই-সঙ্গে তিমি, ডলফিন জাতীয় স্তন্যপায়ীর দল। মাছের মতো শিরদাঁড়া নেই এমন সব প্রাণী—যেমন, স্কুইড বা অক্টোপাসও সাধারাণতঃ ঘোরাফেরা করে ঐ মাঝসমুদ্রে। মাঝসমুদ্রে আড়াল আড়াল নেই বলে ওখানকরা বাসিন্দাদের একদিকে আত্মরক্ষার জন্য আর অন্যদিকে শিকারের খোঁজে ক্রমাগতঃ ছুটে বেড়াতে হয়।

'পর্তুগীজ ম্যান-অব-ওয়ার'-এর আর এক নাম ঝুলন্ত বারান্দা। এ হলো এক ধরনের জেলী মাছ যার কোষগুলো বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। কিছু কোষের কাজ হলো পুরো প্রাণীটাকে জলে ভাসিয়ে রাখা; কোন কোন কোষ খাবার যোগাড় করে, কিছু কোষের আবার অন্য প্রাণীদের শরীরে হুল ফোটানোই কাজ।

'সেইলফিশ্' নামে এক ধরনের সামুদ্রিক মাছকে ঘন্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে জলের মধ্যে ছুটতে দেখা গেছে; ১৫ বছর বেঁচে থাকতে হলে টুনা-মাছকে পাড়ি দিতে হয় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ কিলোমিটার পথ। অধিকাংশ মাছই যে সমুদ্রের জলে অনায়াসে ভেসে বেড়ায়—সে ওদের শরীরের এক বিশেষ থলির জন্যই। এটা দেখতে অনেকটা বেলুনের মতো; মাছেদের রক্ত থেকে অক্সিজেন নেওয়ার ফলে এটা যখন ফুলে ওঠে, জলের মধ্যে মাছের ভেসে থাকায় আর কোনও বাধা থাকে না। তবে বেলুনটাকে অক্সিজেন দিয়ে ভরতে বা বেলুন থেকে অক্সিজেন বের করে নিতে এদের বেশ খানিকটা সময় লাগে।

গভীর জলের মাছেদের ডাঙায় তুলে আনার সাথে সাথেই যে তারা মারা পড়ে তার কারণ—গভীর সমুদ্রের তুলনায় উপরের জলের চাপ অনেক কম হওয়ার দরুণ বেলুনটা হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠে শরীরের অন্যান্য যন্ত্রাংশগুলির উপর অস্বাভাবিক চাপ দেয়। আর তারই ফলে মাছের শরীরের ভেতরটা একদম ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

উপকূলের কাছে অগভীর সমুদ্রে লক্ষ-কোটি সামুদ্রিক প্রাণী আর গাছপালাদের ঘরসংসার। ভীড় যেখানে বেশী, শত্রুর ভয়ও সেখানেই বেশী। শত্রুর মোকাবিলা করতে তো বটেই, সময়ে সময়ে শিকার ধরতেও জলের বাসিন্দাদের অনেককেই ছদ্মবেশ নিতে হয়। সামুদ্রিক প্রাণীর রঙ-বাহার আসলে ওদের ছদ্মবেশেরই অঙ্গ। অনেক সময় রঙেও কাজ হাসিল হয় না। বাধ্য হয়ে অনেককেই তাই প্রয়োজন মতো চেহারা পাল্টানো আর আলো ছড়ানোর কায়দাও রপ্ত করতে হয়েছে।

সমুদ্রের তলায় ফোটা ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে শিকারের আশায় ওৎ পেতে বসে থাকে 'সি-অ্যানিমোন' বা 'সাগর-

কুসুমের দল। এদেরই সগোত্র প্রাণী প্রবালকীটেরা নিজেদের চারপাশে চুনপাথরের রঙচঙে খোলস এ'টে পড়ে থাকে, দেখতে লাগে আর পাঁচটা সামুদ্রিক উদ্ভিদের মতোই।

এদেরই কাছাকাছি থাকে ছদ্মবেশী কাঁকড়ারা। 'হায়াস' নামে একজাতের কাঁকড়ার গায়ের রঙ্ সবুজ। নীল-সবুজ শ্যাওলাদের মাঝে এরা যখন মিশে থাকে তখন এদের চিনে বের করাই মুশকিল। আবার, 'পিসা' নামে আরেকজাতের কাঁকড়া নিজেদের শক্ত খোলসের উপর ছোট ছোট হুকের গায়ে স্পঞ্জ, প্রবাল, শ্যাওলা—যা পায় তাই গে'থে নেয়। দেখে তখন ওদের কাঁকড়া বলে চেনাই দায়!

ছদ্মবেশ ধরার ব্যাপারে সামুদ্রিক মাছেরাও কমতি যায় না। ওদের অনেককেই হুবহু সামুদ্রিক গাছপালাদের মতো দেখতে। অস্ট্রেলিয়ার ড্রাগন-মাছেরা গাছপালার ভেতর একবার লুকোলে আর তাদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। পাইপ-মাছেরা 'ইল-ঘাস' নামে একধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদের লম্বা সরু পাতার সঙ্গে গা মিলিয়ে থাকে। এমনকি পাতার মতোই নিজের শরীরটাকে জলের ভেতর ঝুলিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটার আজব কায়দা রপ্ত করেছে ওরা; দেখে মনে হয়—গাছের পাতাই যেন এদিক ওদিক দুলছে। সমুদ্র-ঘোড়ারা আবার গাছের বদলে প্রবালের রঙ্চঙে ডালপালার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে নেয়। সারগাসোম নামে একধরনের সামুদ্রিক আগাছার সাথে মিশে থাকে বলে ইঞ্চিদুয়েক লম্বা বিশেষ একজাতের মাছের তো নামই হয়ে গেছে সারগাসোম মাছ।

প্রবালের ভীড়ে লুকোনোর ব্যাপারটা মাছেদের অনেকেই রপ্ত করেছে। এদের মধ্যে সী-পার্চ মাছেদের ব্যাপারটা বেশ মজার। এদের সারা গা ভর্তি থাকে লাল রঙের ফুটকিতে। অস্ট্রেলিয়ার লালরঙা প্রবালদ্বীপগুলোর আশপাশে এরা ঘুর-ঘুর করে; বিপদ দেখলেই একছুটে গিয়ে আশ্রয় নেয় প্রবাল-দের ভীড়ে। প্রবাল আর মাছের রঙ্ তখন মিলে মিশে একাকার।
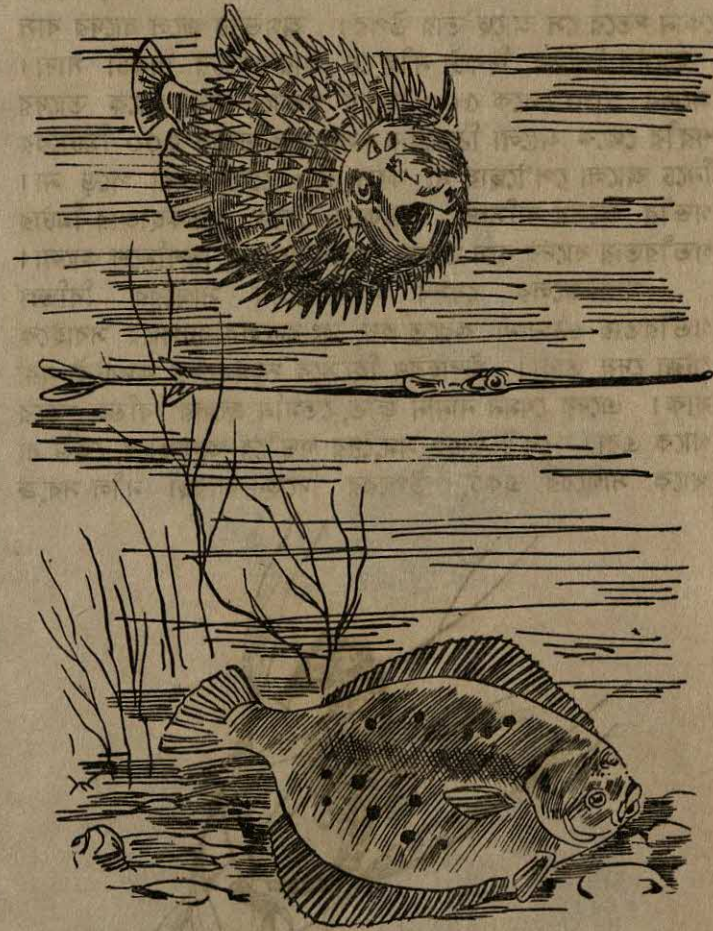
মাছেদের রকমফের: গ্লোব মাছ (উপরে) সব সময়েই যেন মারমুখী হয়ে থাকে। এদের সারা গায়ে থাকে কাঁটার বর্ম। কর্নেট মাছ (মাঝে) আকারে সরু নরুণের মতো। সোল (নিচে) তার ভারী চেহারার জন্য যেন নড়তে চড়তেই নারাজ। অগভীর সমুদ্রতলে এরা সামুদ্রিক গাছগাছালী আর সাগরকুসুমদের ধারে কাছে দিন কাটায়।

সাগরজলের বাসিন্দাদের গায়ের রং নির্ভর করে, জলের কোন স্তরে সে আছে তার উপর। অগভীর জলে যাদের বাস —তাদের পিঠের দিকটা নীলচে আর পেটের দিকটা সাদা। জলের ১০০ থেকে ৫০০ মিটার গভীরে যারা থাকে তাদের শরীর থেকে আলো ঠিকরোয়। সমুদ্রের তলায় ২০০ মিটারের নিচে আলো পেঁছোয় না, ফলে রংও চোখে ধরা পড়ে না। গভীর জলের বাসিন্দা, কয়েকশো থেকে কয়েকহাজার মিটার গভীরতায় যাদের বাস তাদের গায়ের রং তাই মিশমিশে কালো।

সাগরজলের যেসব বাসিন্দাদের সাগরের বিভিন্ন গভীরতায় ওঠানামা করতে হয়, রং-বদলের ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দেয় তারা। উদাহরণ হিসেবে স্কুইডদের কথাটাই ধরা যাক। এদের যেমন নানান জাত, তেমনি জলের বিভিন্ন স্তরে থাকে এরা। কেউ থাকে সমুদ্রের গভীরে অন্ধকারে, কেউ বা থাকে সাগরের একটু উপরের দিকে—আবছা নীল-সবুজ আলোর রাজ্যে। শুধু রং বদলানোই নয়, রং ছড়ানো কিংবা আলো জ্বালানোর কায়দাও রপ্ত করেছে এরা।

সমুদ্রঘোড়া 'হিপোক্যাম্পাস'

স্কুইডদের চামড়ার উপর থাকে নানা ধরনের রঞ্জক-কোষ —ঠিক যেন রঙের থলে। এর কোনটাতে থাকে লাল রং, কোনটাতে বা সবুজ। শত্রুর দেখা পেলেই কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্রের নির্দেশ যায় বিশেষ ধরনের রঞ্জক-কোষে আর অমনি সেই কোষগুলি বিশেষ রংটি দিয়ে রাঙিয়ে দেয় স্কুইডের গোটা শরীরটাকে। লাল রঙের স্কুইড বেগতিক দেখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গায়ের রং পালটে সবুজ করে নিতে পারে।

শুধু তাই নয়, স্কুইডদের শরীরে আছে বিশেষ ধরনের গ্রন্থি যা প্রয়োজন মতো কালো রং নিঃসরণ করে। বড়োসড়ো বিপদ দেখলে স্কুইডরা তাই কালো রং জলের মধ্যে ঢেলে দিয়ে চারদিক আঁধার করে দেয়। শত্রুর সাধ্য কি তখন তাকে চেনে! সমুদ্রের আরো গভীরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দেশে—স্কুইডদের রং বদলানো—রং ছড়ানোর কারসাজি কোনও কাজেই আসে না। গভীর জলের স্কুইডরা তাই তাদের চামড়ার ফাঁকে সাজিয়ে রেখেছে আলো-জ্বালানো রাসায়নিক 'লুসিফেরিন'। দরকার মতো তাই খরচা করে আলো জ্বালায় ওরা।

স্কুইডদের মতো চিংড়ীরাও অনেকে রং বদলানোয় রীতি-মতো পটু। এরা জলের বিভিন্ন গভীরতায় ওঠানামার সময় রং-এর সাজ ঘন ঘন পাল্টায়। এই হয়তো স্বচ্ছ কোনও গলদা চিংড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছিলো জলে, একটু পরেই দেখা যাবে—তার শরীরের অর্ধেকটা আগের মতো স্বচ্ছ থাকলেও বাকী আধখানা শরীরে টুকটুকে লাল রং ধরেছে!

'নটোস্টোমাস'-নামে এক বিশেষ জাতের চিংড়ীদের আনাগোনা জলের এক বিশেষ স্তরে যেখানে নীল-সবুজ ছাড়া অন্য রং-এর আলো পেঁছোয় না। আলোয় অদৃশ্য হয়ে থাকার জন্য এইসব চিংড়ীরা নিজেদের শরীরটাকে মুড়ে নেয় লাল রং-এ। ব্যাস্, নীল-সবুজ আলো আর তখন ওদের গায়ে প্রতিফলিত হয় না, ফলে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না ওদের।

চিংড়ীদের মতোই আর এক ছদ্মবেশী বহুরূপীর নাম 'সামুদ্রিক খরগোস'। শামুক জাতীয় প্রাণী হলেও এদের কিন্তু খোলস নেই; ফলে, আত্মরক্ষার জন্য রং বদলানোর কৌশলটা বেশী করে রপ্ত করতে হয়েছে ওদের। ছেলেবেলায় এরা যখন লাল শ্যাওলার কাছাকাছি থাকে তখন এদের অনেকেরই গায়ের রং হয় লাল। বড়ো হলে বাদামী শ্যাওলার কাছাকাছি থাকে বলে এরা নিজেদের রংটাকেও পালটে বাদামী করে নেয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রে এদের দেখা মেলে।

গভীর সমুদ্রে, জলের পাঁচ-ছ'শো মিটার নিচে ঘন অন্ধকারে প্রাণীরা সব চোখ থাকতেও অন্ধ! বাধ্য হয়েই তাই সাগরজলের বাসিন্দাদের অনেককেই আলোর ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে—যে আলোয় শিকারকে খুঁজে নেওয়া যায়।

অনেকে আবার স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যেই নিজেদের চারপাশে আলোর বেষ্টনী গড়ে নেয়। তবে আলো জ্বালানোর কারসাজিটা শুধু যে গভীর জলের বাসিন্দারেরই একচেটিয়া—এমনটা ভাবলে ভুল হবে। জলের উপরে যে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, জুপ্ল্যাঙ্কটন, ডাইনোফ্ল্যাজেলেট-জাতীয় এককোষী জীবরা ভেসে বেড়ায় তাদের অনেকেই অন্ধকার রাতে সাগরের বুক আলোর রোশনাই-এ ভরে দেয়।

ডাইনোফ্লাজেলেটদের এক বিশেষ গোষ্ঠী—'নক্‌টিলুকা'-দের আলো জ্বালানোর কারণটা ভারি মজার। এরা হলো জু-প্ল্যাঙ্কটনদের শত্রু। রাতের আঁধারে সাগরতলের প্রাণীরা যখন জু-প্ল্যাঙ্কটনদের খোঁজে উপরে উঠে আসে, 'নকটিলুকা'রা আলো জ্বালিয়ে তাদের শিকার ধরতে সহায্য করে।

ক্ষুদে প্রাণী 'সাইপ্রিডিনা'রা বেগতিক দেখলে নিজেদের চারপাশে আলো জ্বালিয়ে দেয়। শত্রুরা কাছে এলেই এই ক্ষুদে মাছগুলো ওদের মুখের দু'পাশের গ্রন্থি থেকে 'লুসিফেরিন' নামে রাসায়নিকটি জলে ঢেলে দেয়। জলের অক্সিজেনের সাথে লুসিফেরিন-এর বিক্রিয়ার ফলেই আলো জ্বলে সাইপ্রিডিনাদের চারপাশে। আলোর সেই বেষ্টনী ভেদ করে তখন কে এগোবে ওদের কাছে? গভীর জলের চিংড়ীদের প্রিয় খাদ্য—জলের উপর ভেসে বেড়ানো প্ল্যাঙ্কটন। দিনের বেলায় ওদের খোঁজে বেরোলে
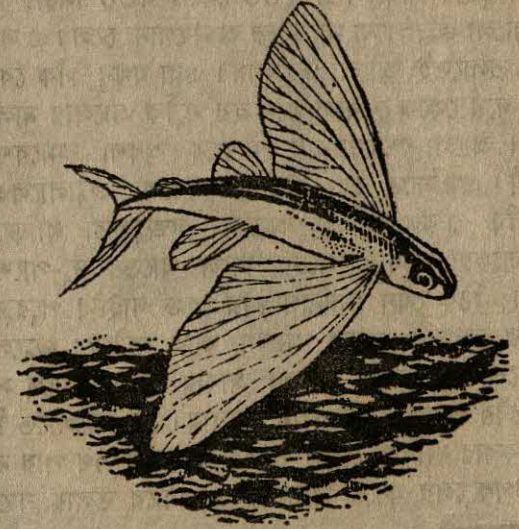
উড়ুক্কু মাছ
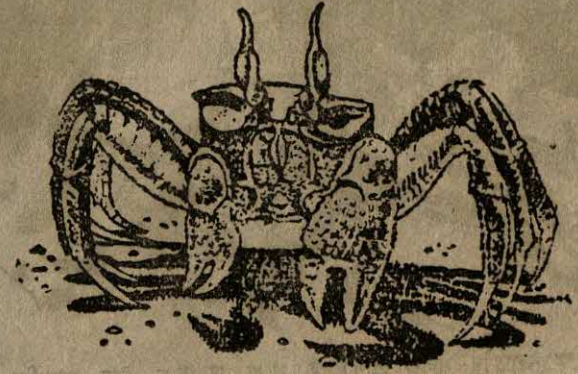
বিকটদর্শন অতিকায় কাঁকড়া—ইংরাজী নাম 'ঘোস্ট ক্র্যাব'।

বিপদের সম্ভাবনা—শত্রুরা দেখে ফেলতে পারে; রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে ওরা তাই নিজেদের আলোয় পথ চিনে চলে আসে প্ল্যাঙ্কটনদের কাছে।

সমুদ্রের সাধারণতঃ ২০০ থেকে ৭০০ মিটার গভীরতা-তেই আলো জ্বালানো মাছেদের আনাগোনা চলে। এ সব মাছেরা পেটের তলাতেই আলো জ্বালায়। ওরা যখন ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, দূর থেকে দেখলে মনে হয়, বুঝি আলোর মালা এগিয়ে চলেছে। আলো জ্বালানোর ব্যাপারে অবশ্য কমবেশী সবাই হিসেবী। এমনিতে এরা টিমটিমে আলো জ্বালালেও, শত্রুর উপস্থিতি টের পেলেই আলো উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দেয়। লন্ঠন-মাছেরা আবার পেটের বদলে ঘাড়ের দু-পাশে আলো জ্বালায়; ঠিক যেন মোটরগাড়ীর হেড লাইট! পুরুষ লন্ঠন-মাছেদের লেজেও জ্বলে আলো, আর স্ত্রীদের জ্বলে পেটের নিচে। কোনও কোনও মাছের আবার ঘাড়ের কাছে সরু শুঁড় থেকে তীব্র আলোর ঝলকানি বেরোয়। সে আলোতে শিকারের চোখ একবার ধাঁধিয়ে গেলে পালানোর আর পথ পায় না তারা।

উপকূলের কাছে সাগরের একেবারে তলায় যাদের বাস,
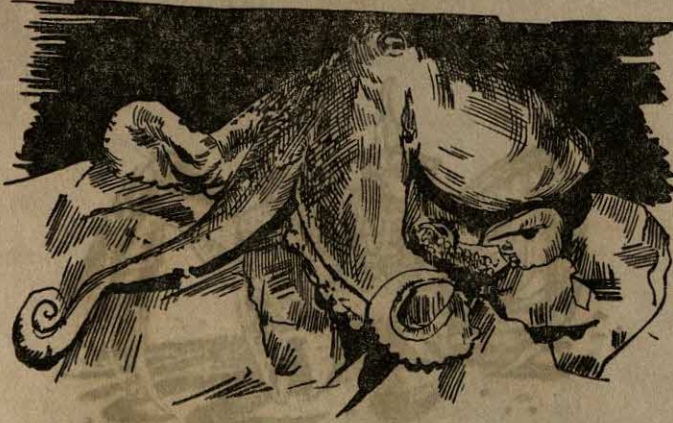
'মোলাস্ক' জাতীয় জলজ প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু প্রজাতি হলো 'অক্টোপাস'। বুদ্ধিতে এরা স্তন্যপায়ীদের চেয়ে খাটো নয়।

সেইসব সামুদ্রিক উদ্ভিদ, শামুক, ঝিনুক, সাগরকুসুম কিংবা তারামাছদের কথা বাদ দিলে—সমুদ্রের মাঝামাঝি স্তরের বাসিন্দা আর জলের একেবারে উপরে যারা ভেসে বেড়ায়, একজায়গায় স্থির হয়ে থাকাটা তাদের কারোর ধাতে নেই। হাঙর, তিমিরা যেমন শিকারের খোঁজে দূরদূরান্তরে পাড়ি জমায়, তেমনি ক্ষুদে মাছের দলও ঝাঁক বেঁধে জলের বিভিন্ন স্তরে নিয়মিত ওঠানামা করে। ইকো-সাউন্ডার দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে—১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাপের নানা জাতের মাছ রাতের সময়ে ঝাঁক বেঁধে জলের উপরের দিকে উঠে আসে। সাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নানা জাতের প্ল্যাঙ্কটন যে জলের উপর ভেসে বেড়ায়—দিনের বেলায় সূর্যের অতিরিক্ত তাপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে এরা ডুব দেয় সাগরের গভীরে। সম্ভবতঃ রাতের বেলায় এরা যখন ফের জলের উপর ভেসে ওঠে, এদের পেছন পেছন ধাওয়া করে উঠে আসে ক্ষুদে মাছের দল।

জীবনধারণের তাগিদে সময়ে সময়ে মাছ আর সামুদ্রিক প্রাণীদের অনেককেই সাগরের এক জায়গা থেকে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়। দেশান্তরী মাছেদের মধ্যে 'ঈল'-দের ব্যাপারটা সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক।

সোভিয়েত রাশিয়ার বালটিক সাগরের আশপাশের নদী আর হ্রদগুলিতে যেসব ঈল মাছ ঘুরে বেড়ায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সমুদ্রে পাড়ি জমায়। নদীতে বাঁধ দিয়েও এদের আটকানো যায় না। বালটিক সাগরে পড়েই ঈলেরা উত্তর সাগরের দিকে যাত্রা শুরু করে। উত্তর সাগরে পেঁছে এরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরে অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে চলে যায়। মধ্য-অতলান্তিকের বারমুডা দ্বীপের কাছে সারগাসো-সাগরে গিয়ে ডিম পাড়ে ওরা।

আশ্চর্যের ব্যাপার—ডিম ফুটে বেরিয়েই বাচ্চা-ঈল উল্টো পথে চলা শুরু করে। বালটিক সাগরে পেঁছতে লাগে প্রায় তিন বছর সময়। বালটিক সাগরে পেঁছনোর পর ওদের বাবা-মা যে

নদী বা হ্রদ থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলো সেখানে ঠিক ঢুকে পড়ে ওরা। নদী বা হ্রদের মিষ্টি জলে বছর দশেক কাটিয়ে পূর্ণবয়স্ক ঈল ওদের বাবা-মা'র মতোই একদিন আবার ডিম পাড়ার জন্য সারগাসো-সাগরের পথে যাত্রা করে।

আমেরিকার উপকূল অঞ্চল থেকেও ঈলেরা ডিম পাড়তে সারগাসো সাগরে আসে এবং ওদের ডিম ফুটে যে লার্ভা বেরোয় তার সঙ্গে ইউরোপীয় ঈলের লার্ভার কোনও অমিল না থাকা সত্ত্বেও, ভুলেও কিন্তু মার্কিন ঈলের বাচ্চারা কখনো ইয়োরোপের পথে পাড়ি জমায় না। কি করে যে ঐ ক্ষুদে মাছ-গুলো পথ চিনে চিনে ওদের তালুক-মুলুকে পৌঁছে যায় তা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমতো রহস্য; তবে অনেকের অনুমান, এ ব্যাপারে মহাসাগরীয় স্রোতের একটা ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে।

দেখা গেছে, নীল রঙের পাখনাওয়ালা টুনা মাছেরাও ডিম পাড়ার তাগিদে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে গিয়ে হাজির হয়। মে মাসে ডিম ছাড়ার পর উপসাগরীয় স্রোত ধরে ওরা উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে 'নোভাস্কটিয়া'য় পৌঁছোয় সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ। বাহামার কাছে এ জাতীয় মাছেদের গায়ে বিশেষ ধরনের চিহ্ন লাগিয়ে দিয়ে নোভাস্কটিয়ার কাছে ওদের ফের ধরার পরে দেখা গেছে—ওদের কোন কোনটার ওজন ১৮০ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ৩০০ কিলোগ্রামে গিয়ে ঠেকেছে! প্রশান্ত মহাসাগরের স্যামন মাছেদের ক্ষেত্রেও এমন ভবঘুরে স্বভাব দখা যায়।

স্যামনরা সাধারণতঃ নদীতে জন্মানোর পর সাগরের দিকে যাত্রা শুরু করে। সাগরে বছর কয়েক কাটানোর পর ডিম ছাড়ার সময় জলেই ওরা ফিরে আসে সেই নদীতে যেখানে ওদের নিজেদেরই একসময় জন্ম হয়েছিলো। সমুদ্র থেকে নিজের নিজের নদীতে ফিরে আসার ব্যাপারে ওদের নাকের ভূমিকা আছে বলে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা। পরীক্ষায় দেখা গেছে—ঘরমুখো স্যামনের নাক বুজিয়ে দিয়ে গন্ধ শোঁকার রাস্তা

অতিকায় 'মুন' মাছ

বন্ধ করলে, কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে ওরা। তাছাড়া বিভিন্ন জাতের স্যামনের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে—ভবঘুরেদের মস্তিষ্কের গন্ধ সংক্রান্ত অংশটা স্যামনের অন্য জাতের তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয়। সম্ভবতঃ কয়েকবছর সাগরে কাটানোর পর এদের শরীরে এমন কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন আসে যা ওদের ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং নিজের নদী-নালার বিশেষ গন্ধটা ওদের স্মৃতিতে থাকে বলেই ঠিক ঠিক পথ চিনে ওরা পৌঁছোতে পারে নিজেদের আকাঙ্খিত ঠিকানায়।

ঈল-স্যামন-টুনা'র মতোই সমুদ্রের আর এক ভবঘুরে প্রাণী হলো 'সীল'। তিমির মতো সীলকেও আমরা মাছ বলে ভুল করি। এরা আসলে স্তন্যপায়ী এবং তিমির মতো এরাও একসময় ছিলো ডাঙ্গার জীব। সীল-এর অন্ততঃ ৩০টি
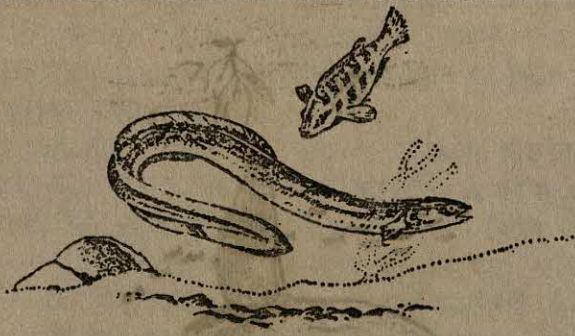
ঈল মাছ

প্রজাতির সন্ধান এ যাবৎ মিলেছে। অনেকের ধারণা—সীল হলো তুষার-রাজ্যের প্রাণী; মেরু অঞ্চলের এস্‌কিমোরাই শুধু বরফ খুঁড়ে হারপুন দিয়ে শীল শিকার করে। ধারণাটা ভুল। পৃথিবীর হেন সাগর নেই যেখানে এই প্রাণীটির দেখা মেলে না। ক্যাস্পিয়ানের মতো উষ্ণ-সাগরেও সীল-এর সন্ধান মিলেছে; তবে একসময় যে এরা সত্যিই তুষার-ঢাকা মেরু অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলো সেটা যেন মনে রেখেই প্রতিবছর শীতের সময় ক্যাস্পিয়ানের উত্তরে বরফে ঢাকা অঞ্চলে গিয়ে এরা বাচ্চা প্রসব করে।

সীল-এরই একটা বিশেষ প্রজাতির নাম 'সন্ন্যাসী-সীল'। কোনও একসময় দক্ষিণ-মেরুতে বসবাস করলেও শ'দুয়েক বছর আগে এরা চলে আসে ভূমধ্য সাগরে। এখন অবশ্য ভূমধ্য সাগরেও এদের বিশেষ দেখা মেলে না; এদের অধিকাংশই চলে গেছে অতলান্তিক মহাসাগরে—আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে। সন্ন্যাসী সীল-এর একদল পাড়ি জমিয়েছিলো ইয়োরোপ আর মধ্য আমেরিকার উপকূলে। মানুষের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে এরা এখন চলে এসেছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আশপাশে।

আলো বা বেতার তরঙ্গ জলের মধ্যে দিয়ে বেশীদূর যেতে না পারলেও—শব্দতরঙ্গ কিন্তু বাতাসের তুলনায় পাঁচ-গুণ বেগে ছুটে চলে জলের ভেতর। তাই বুঝি বিদঘুটে আওয়াজ করে শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার কায়দা-কৌশল রপ্ত করেছে সামুদ্রিক প্রাণীদের কেউ কেউ; অবশ্য সময়ে সময়ে ঐ আওয়াজ করার জন্যই মানুষের হাতে ধরা পড়ে ওরা। চীন সাগরের আশে পাশে, মালয় দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা আজও যখন তাদের সাম্পান নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়—তাদের সঙ্গে থাকে একজন খোঁজারু। লোকটির কাজ হলো জলের ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার নিচে কান-টাকে রেখে সমুদ্রের নিচে চলে বেড়ানো মাছের ঝাঁকের আওয়াজ শোনা। অভিজ্ঞ খোঁজারু আবার জলে কান পেতে বলে দিতে পারে—কি ধরনের মাছ ওগুলো এবং কোন্‌দিকে চলেছে ওরা।

সাগরের নিচে মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীরা যে রীতি-মতো কোলাহল বাঁধায় তা প্রথম জানা গেলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ঐসময় একবার এক মার্কিন ডুবো জাহাজ বোর্নিও দ্বীপের কাছাকাছি ম্যাকাসার-প্রণালী দিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ জাহাজের হাইড্রোফোনে ধরা পড়লো প্রচণ্ড আওয়াজ। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাবলেন, নিশ্চয়ই জাপানীরা নতুন ধরনের মাইন বসিয়েছে জলের তলায়; অতএব দেরী না করে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে তিনি সরে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একই ঘটনা ঘটলো একটা জাপানী ডুবোজাহাজের ক্ষেত্রেও। জাপানী ক্যাপটেনও ভাবলেন—আমেরিকানরাই বুঝি মাইন বসিয়েছে ওখানে। পরে জানা গেলো—যে আওয়াজে দুই ডুবোজাহাজের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, তা করছিলো এক বিশেষ জাতের চিংড়ীমাছ। মাঝে মাঝে ঐ চিংড়ীগুলোর চ্যাঁচামেচির জোর এত বাড়ে যে জাপানী দ্বীপগুলোর গ্রাম্য অধিবাসীরা তাদের বাড়ীতে বসেও সে আওয়াজে চম্‌কে ওঠে। কখনো কখনো মাছ, চিংড়ী এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের কলতান এমনই জোরদার হয়ে ওঠে যে সময়ে সময়ে তা জাহাজের নাবিকদের গানকেও ছাপিয়ে যায়।

মাছেরা যে শব্দ করতে পারে এ তথ্য প্রাচীন যুগের মানুষেরও একেবারে অজানা ছিলো না। রোমানরা কথা-বলা মাছের নাম দিয়েছিলো 'কাক'; গ্রীকরা আবার ব্যাঙেদের সাথে এইসব মাছের তুলনা করতো। 'ওডিসি'—মহাকাব্যে হোমার 'সাইরেন' নামে এমন এক মাছের কথা বলেছেন যাদের সুরেলা আওয়াজে নাবিকরা রীতিমতো আকৃষ্ট হতো। ভূমধ্য সাগরের 'ড্রামফিশ্'-কেও সুরেলা আওয়াজ করতে দেখা যায়; হয়তো হোমারের 'সাইরেন'-ই আজকের ড্রামফিশ। 'বিগল্'-জাহাজে চেপে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে চার্লস ডারউইন দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে নদীর তীরে বেশ জোরালো 'ফট্‌ফট্' আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। পরে জানা গেছিলো—ওটা 'আর্মাডো'-মাছের কীর্তি।

মাছেদের আওয়াজেরও রকমফের অনেক। 'স্প্র্যাট' মাছেরা খাবার সময় বাতাসে পাতা নড়ার মতো খস্‌খস্ আওয়াজ করে; খাবার গেলার সময় 'কার্প' মাছ আওয়াজ করে ঠোঁট বন্ধ করে। সার্ডিনদের আওয়াজ শুনে মনে হয়, যেন ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে। সবচেয়ে কর্কশ আওয়াজ করে 'গার্ণার্ড'-মাছেরা। সম্ভাব্য শত্রুদের দূরে রাখবার জন্যই সম্ভবতঃ এরা বিকট শব্দ করে চলে। মাছধরা জাহাজের উপর গার্ণার্ড-এর ঝাঁক ঢেলে দিলেই এরা হৈ-হট্টগোল বাঁধিয়ে দেয়। অ্যাকোরিয়ামে রাখা গার্ণার্ড মাছের গায়ে আলতো করে হাত বোলালে সেটা মৃদু মচ্‌মচ্ শব্দ করে কিন্তু বেশী বিরক্ত করলেই একেবারে চিল-চীৎকার লাগিয়ে দেয়।

বিনা কারণে মাছেরা যে আওয়াজ করে না তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবারই। অ্যাকোরিয়ামে বন্দী এ জাতীয় মাছেদের উপর নজর রেখে দেখা গেছে, জলের মধ্যে কিছু ফেললেই এরা গোলমাল শুরু করে; শত্রুর দেখা পেলে এই গোলমাল আরো বেড়ে যায়। অ্যাকোরিয়ামে রাখা ঐসব মাছেদের ঠেলে, খুঁচিয়ে বা বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে উত্যক্ত করলে কিংবা ওদের খাবার দেওয়া বন্ধ করলে—ওরা দাঁতে দাঁত ঘষে
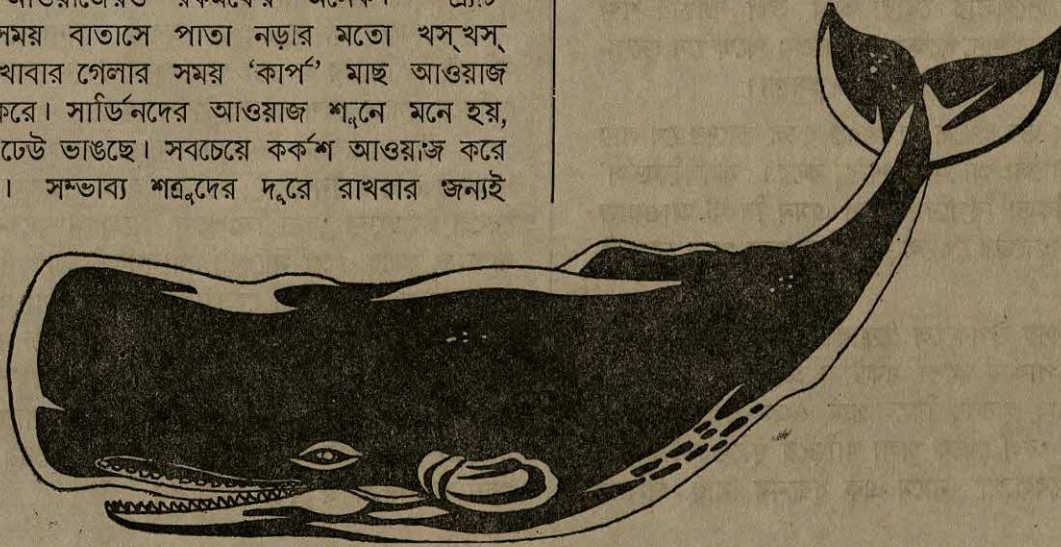
স্পার্ম তিমি—লম্বায় ১৮ মিটার। মাথায় এদের চর্বির বিপুল ভাণ্ডার। নাবিকরা স্পার্ম তিমির দাঁতকে গয়না হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

বিদ্ঘুটে এক আওয়াজ করে ওদের প্রতিক্রিয়া জানায়। কোনও কোনও মাছ আবার সন্ধ্যে না হলে আওয়াজ শুরু করে না। তবে, কোনও জাহাজ কাছাকাছি এলে—এদের সবারই চীৎকার চ্যাঁচামেচি বন্ধ হয়ে যায়।

চিংড়ীমাছের গোলমালের কথা আগেই বলেছি, কোন কোন জাতের চিংড়ীর আওয়াজ অনেকটা, কড়াইতে তেল ফোটার 'চট্ চট্' কিংবা শুকনো ডালপালা পোড়ানোর শব্দের মতো। এই ধরনের চিংড়ীর বড়ো দাঁড়াগুলিতে থাকে একটা ছোট ফাঁকা জায়গা যেখান থেকে বোতলের ছিপি খোলার মতো 'ফট্‌ফট্' শব্দ একটানা বেরিয়ে আসে। কোনও কোনও জায়গায় এই শব্দ দিনে রাতে কখনো থামে না। এই ধরনের চিংড়ী মাছের বড়ো একটা ঝাঁক যুদ্ধের সময় একটা ডুবো-জাহাজকে আশ্রয় যোগাতে পারে। এইসব মাছেদের ঐকতানের কাছে ডুবোজাহাজের প্রপেলার ঘোরা আর জল ভাঙার শব্দ চাপা পড়ে। জলের উপর শত্রুপক্ষের জাহাজের পক্ষে সে ডুবো-জাহাজকে খুঁজে বের করা রীতিমতো দুঃসাধ্য।

গলদা চিংড়ীরা ভয় পেলে বা বিরক্ত হলে তাদের খোলার গায়ে দাঁড়া ঘষে জোরালো আওয়াজ শুরু করে। 'অ্যালফির্ডস' নামে এক জাতের কাঁকড়া বিপদে পড়লে এমন বিকট আওয়াজ করে, যে মনে হয় জাহাজের খোলে বুঝি লোহার পাত বোঝাই করা হচ্ছে।

উত্তর আমেরিকার উপকূলে 'ক্রোকার' নামে এক ধরনের ক্ষুদে মাছ ঝিঁঝিঁ পোকার মতো একটানা আওয়াজ করে চলে সারারাত ধরে। আবার হাজার কিলোগ্রাম ওজন-ওয়ালা 'মুন' নামে দৈত্য-মাছেরাও জল থেকে গলা বাড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে শব্দ করে থাকে। 'বেলুগা' নামে এক ধরনের মাছ পাওয়া যায় 'ক্যাস্পিয়ান' সাগরে; জেলেদের জালে ধরা পড়ার পর এদের আওয়াজটা শোনায় ঠিক দীর্ঘশ্বাসের মতো!

তিমি বা শুশুকের গুঞ্জনের কথা কে না শুনেছে। মনের ভাব আদানপ্রদানের জন্য এরা আওয়াজ করে থাকে বলে অনেকেরই ধারণা। সাগরতীরের বাসিন্দারাও তিমি'র আওয়াজকে ঘিরে কতো না গল্প ফেঁদেছে! নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জের প্রচলিত লোককথায় তো 'গিরি' নামে তিমি রাজ-কন্যার সাথে জেলের ছেলে 'শোয়ান'-এর বিয়ের কথাও রয়েছে।

গল্পটা এইরকমঃ "সাগরের নিচে রাজপ্রাসাদে তিমি রাজকন্যার সাথে ঘর করতো শোয়ান। তারপর একদিন যখন শোয়ান তার নিজের মায়ের সাথে দেখা করতে গ্রামের বাড়ীতে গেছে, ঘটনাচক্রে মারা পড়ে সে। তিমি-রাজকন্যা 'শোয়ানে'র অপেক্ষায় বসে থাকে পাড়ের কাছে—শোয়ানকে ডাকে আর করুণ সুরে গান গায়।"......

আনন্দে না দুঃখে তা অবশ্য জানা নেই, তবে সত্যি সত্যিই তিমিদের গাওয়া গান গ্রামোফোন রেকর্ড হয়ে বাজারে বেরিয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর আগে।

মাছেরা যেমন নিজেরা আওয়াজ করে তেমনি আওয়াজ শুনতেও পায় নিশ্চয়ই; তা না হলে ছিপধারীরা জলে চার ফেলে মাছেদের জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করেন কেন? অথবা, জাহাজ কাছে এলে মাছেরা গোলমালই বা থামিয়ে দেয় কেন? তবে 'কান' বলতে যা বোঝায় তা মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের একেবারেই নেই। রুশ জীববিজ্ঞানী ফ্রোলোভ-এর তাই ধারণা, মাছেদের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দেহের টানা রেখাগুলির সাহায্যে মাছেরা হয়তো শব্দ শোনে। সেদিক থেকে দেখলে, ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত। মৎস্যকুলের গোটা শরীরটাই যেন কানের কাজ করে চলেছে!

এগারো

কথায় বলে, জলে কুমীর—ডাঙগায় বাঘ! নিক্তিতে চাপালে অবশ্য—ডাঙগার বাঘ-সিংহ-হাতী-গণ্ডারের চেয়ে জলের কুমীর-হাঙর-অক্টোপাস-তিমিকে ঘিরে মানুষের ভয়ের পাল্লাটাই হয়তো বেশী ঝুঁকবে।

আসলে, মানুষ ডাঙগার জীব বলেই সমুদ্রের সঙ্গে তার সত্যিকারের দূরত্বটা কখনো ঘোচেনি। মানুষের মতো ডাঙগার সব জন্তুজানোয়ারদের কাছেই সমুদ্র যেন এক অন্য গ্রহ—অন্য জগৎ। সে জগতের বাসিন্দা যারা, তাদের হাবভাব-আচার-আচরণ ডাঙগার প্রাণীদের অজানা। তাছাড়া, জলের ঘনত্ব বাতাসের তুলনায় প্রায় ৮০০ গুণ বেশী; ফলে, সাগরে নেমে ইচ্ছে করলেই ওখানকার বাসিন্দাদের ফাঁকি দিয়ে ছুটে পালানো যায় না। জলের মধ্যে মানুষের তৈরী হাতিয়ারও প্রায় অচল, আলোর রশ্মিও বেশীদূর পৌঁছোয় না। মানুষকে তাই জলের মধ্যে এগোতে হয় সন্তর্পণে; সবসময়ই শঙ্কা থাকে বুকের মধ্যে—এই বুঝি হাঙর কিংবা অক্টোপাস এসে পাকড়ে ধরলো। তাহলে তো আর রেহাই নেই।

মজার কথা, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর প্রাণীদের বাইরের চেহারা দেখে তাদের স্বরূপটা আদপেই বোঝা যায় না। কোনটা হয়তো একরত্তি মাছ কিন্তু তার বিষাক্ত কামড়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা পড়তে পারে একজন জোয়ান মানুষ! আবার, কোনটা হয়তো দেখতে থকথকে একদলা জেলির মতো অথচ একটু ছুঁড়ে ফেললেই লক্ষ হুল বিঁধতে থাকে শরীরে। বিবর্তনের পথে পিছনের সারিতে পড়ে থাকলেও মারমূর্তি ধরার ব্যাপারে কিন্তু এরা কেউই কম যায় না।
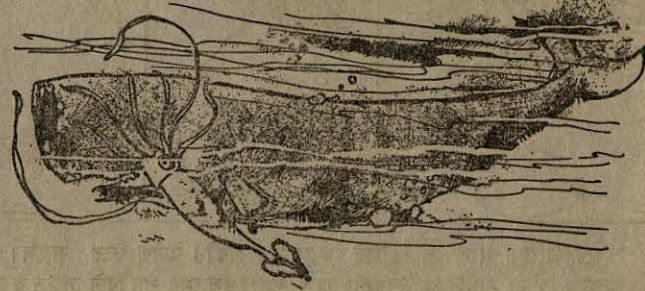
আরব আর আফ্রিকার মাঝখানে এক চিলতে সমুদ্র—এমনিতে তার জলের রঙ নীলচে দেখালেও সূর্যাস্তের সময় তাতে গাঢ় লাল রঙ্ ধরে; সেজন্যই বুঝি এর নাম দেওয়া হয়েছে 'লোহিত সাগর'।

লোহিত সাগরের দুপারেই মরুভূমি। মরুভূমির উষ্ণতার পরশ লেগেছে সাগরেরও গায়ে; ফলে, রীতিমতো গরম তার জল। লোহিত সাগরের উপকূলের জল খনিজ-নুনে বোঝাই। ভারত মহাসাগর থেকে ভেসে আসা এককোষী ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটনরা খনিজ নুন আর অপর্যাপ্ত সূর্যকিরণ পেয়ে হু হু করে বেড়ে ওঠে ওখানে। ওদের পাশাপাশি ভীড় করে থাকে জু-প্ল্যাঙ্কটন আর ডাইনোফ্লাজেলেট্-এর দল। মাঝে মাঝে এদের সংখ্যা এত বাড়ে যে জলের উপর থিক্ থিক্ করে এরা। এদের রঙে লোহিত সাগরের জল রক্তিম হয়ে ওঠে তখন।
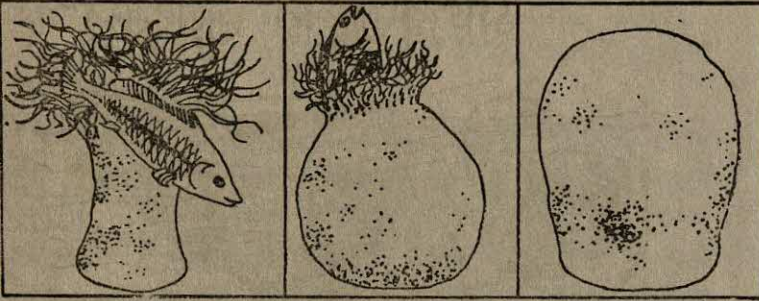
সাগরকুসুমের সংস্পর্শে এলেই মাছেদের শরীর অবশ হয়ে আসে। আস্তে আস্তে গোটা মাছটাকে উদরসাৎ করে সাগরকুসুমের শরীরটা ঢাউস হয়ে ওঠে।
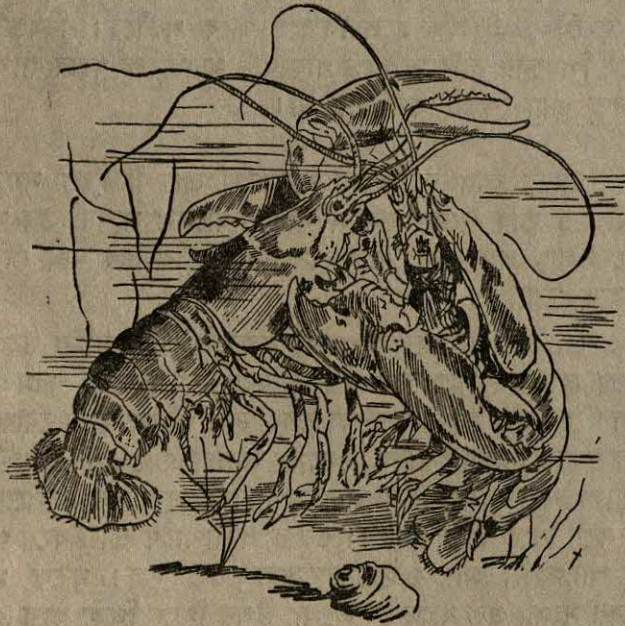
দুই গলদা চিংড়ীর মরনপণ লড়াই।

ডাইনোফ্লাজেলেট—সমুদ্রের ক্ষুদ্রতম প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও নিজের শরীরের মধ্যে বিষ বয়ে নিয়ে বেড়ানোর ক্ষমতা রাখে। সে বিষ মানুষের বড় রকমের ক্ষতি করতে না পারলেও মাছ জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীদের কাছে এরা রীতিমতো মারাত্মক। সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যায়—এ ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হয় তাদের। লোহিত সমুদ্রের উপকূলে ডাইনোফ্লাজেলেটদের বিষে মাছ মরে ভেসে ওঠা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জেলেদের জালে আর পাঁচটা মাছের সঙ্গে বিষাক্ত মরা মাছ মিশে গেলেই বিপত্তি বাধে। মাছ ছাড়া শামুক জাতীয় শক্ত খোলস-ওয়ালা প্রাণীও যে মাঝে মাঝে বিষাক্ত হয়ে ওঠে সেও বোধহয় ঐ ডাইনোফ্লাজেলেটদের গুণেই।

বিষাক্ত চিংড়ী বা ঝিনুক খেয়ে হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া কিংবা পেটের গণ্ডগোল হওয়াটাতো ব্রিটেনের উপকূল অঞ্চলের মানুষদের কাছে রোজকার ঘটনা ছিলো একসময়। গবেষণায় দেখা গেছে,—সমুদ্রের ঐ ক্ষুদে প্রাণীদের শরীরে যে বিষ থাকে তাতে মানুষ মারা না পড়লেও তার শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হওয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া কিংবা হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী অবশ হয়ে পড়ার মতো ঘটনা অবশ্যই ঘটতে পারে।

সাগরজলের প্রাণীদের মধ্যে 'স্পঞ্জ'-এর মতো নিরীহ বোধহয় কেউই নয়। পৃথিবীর বহু দেশে গা-মোছা আর গা-পরিষ্কার করার জন্য স্পঞ্জ ব্যবহার করা হতো এই সেদিন পর্যন্ত। এই প্রাণীটির শারীরিক গঠনে কোনরকম মারপ্যাঁচ নেই বললেই চলে।

স্পঞ্জ আসলে অসংখ্য ক্ষুদে কোষের সমষ্টি—যেগুলির প্রত্যেকটি যেন এক-একটা জলের—ছাঁকনী! আপাত নিরীহ এই প্রাণীটিও সময়ে সময়ে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ আর অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে 'ফিবুলিয়া নলিটান্‌গেরে' নামে একধরনের রক্ত-লাল স্পঞ্জের দেখা মেলে —যার বিষ-ছোঁয়ায় বিপদে পড়তে হয় ডুবুরীদের। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব উপকূলে যারা ঝিনুক-শুক্তির খোঁজে

সাগরে ডুব দেয়—'মাইক্রোসিয়োনা প্রলিফেরা' নামে আর এক জাতের স্পঞ্জের খপ্পরে পড়লে তাদের হাত-পায়ের আঙ্গুল সাময়িকভাবে অবশ হয়ে তো পড়েই, সেইসঙ্গে বিশ্রী ধরনের চর্মরোগও দেখা দেয়। অনেকসময় সাগরের নিচে স্পঞ্জের গায়ে লেপ্টে থাকে 'সাগরটিয়া এলিগ্যান্স' নামে এক ধরনের সী-অ্যানিমোন বা সাগরকুসুম। স্পঞ্জ কুড়োনোর সময় ডুবুরীদের হাতে বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে তাদের মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে এই সাগরকুসুমটি। ভূমধ্যসাগরেই অবশ্য এদের বেশী পাওয়া যায়।

সাগরপাড়ের বালিয়াড়িতে পড়ে থাকে যে শান্তশিষ্ট 'জেলীমাছ' তাদেরই কোন কোনটা কি কম ভয়ঙ্কর! 'মাছ' আখ্যা পেলেও এরা আসলে প্রবালের মতোই 'সিলেন্টারেটা' পর্বভুক্ত প্রাণী। এদের দেখতে থক্‌থকে একতাল জেলীর মতো, বালির উপর পড়ে থাকতে দেখলেই লোভ লাগে। 'সায়ানিয়া' নামে একধরনের জেলীমাছ তার ঐ লাল্‌চে আধা-স্বচ্ছ শরীরটা থেকে ১৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে শিকার ধরতে পারে। সেই শুঁড়ের ছোঁয়া মানুষের শরীরে অসহ্য জ্বালা ধরায়।

এযাবৎ যে আড়াইশো ধরনের জেলীমাছের সন্ধান মিলেছে তাদের মধ্যে দু'চারটেরই অবশ্য এ জাতীয় ক্ষমতা রয়েছে। 'সায়টিকা আর্কটিকা' নামে একজাতের দানবাকৃতি জেলীমাছের বহর দু'মিটারেরও বেশী এবং ৬০ মিটার দূরেও শুঁড় বাড়িয়ে ধরতে পারে এরা। গভীর সমুদ্র ছাড়া এদের দেখা মেলে না—এই যা রক্ষে!

কয়েক ধরনের জেলীমাছ আকারে ছোট হলেও তাদের বিষের দাপট অন্য জাতভাইদের তুলনায় অনেক—অনেকগুণ বেশী। এদের একদল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলের মানুষদেরও কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দেওয়া 'ইরুকান্দজী' নামেই ডাকা হয় এদের। এই ধরনের জেলীমাছের আক্রমণে ঐসব অঞ্চলের জেলেদের
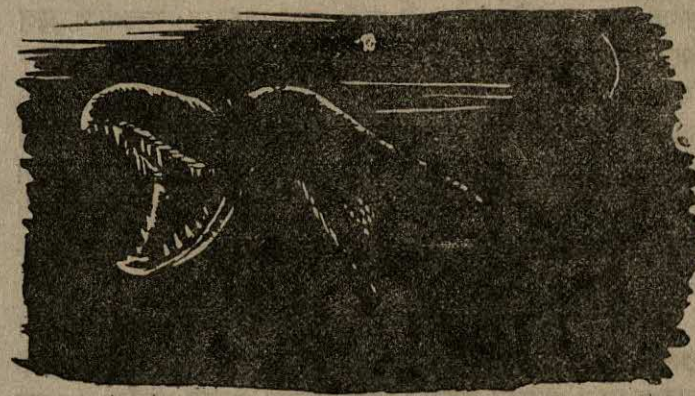
'হা-করা মাছ'—সমুদ্রের গভীরতম অংশে এদের বাস।
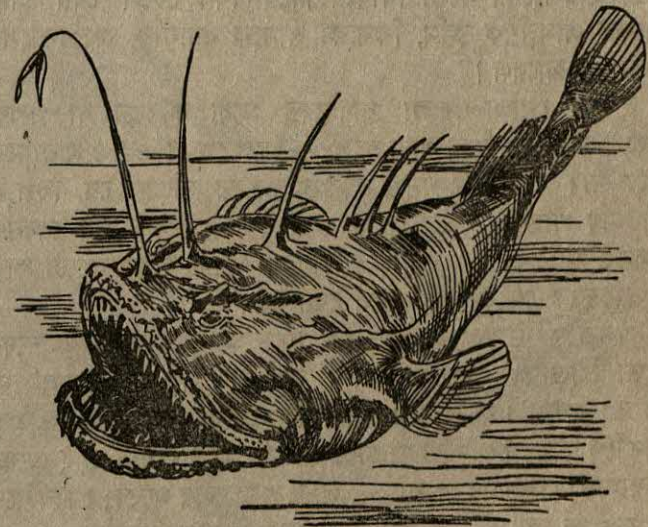
অ্যাংলার মাছ—লম্বায় দেড় মিটার। ৭০টা হেরিং মাছকে একবারে মুখের ভেতর পুরতে পারে।

প্রায়ই বুক-পেট-উরু-মাথা'র যন্ত্রণায় ভুগতে হয়; যন্ত্রণা বাড়লে অনেক সময় শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়। ১৯৬৬ সালে জনৈক বিজ্ঞানী সাগর-জল থেকে এদের বেশ কয়েকটাকে পাকড়াও করেন। দেখা গেলো সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এই প্রাণীগুলির সবচেয়ে বড়োটার ব্যাস ১২ মিলিমিটার আর তার সবচেয়ে বড়ো শুঁড়টা লম্বায় মাত্র ৩৭ মিলিমিটার; আকারে ক্ষুদে হলেও সাঁতারুদের শরীরে এরা একবার হুল ফোটালে তাদের জীবন নিয়ে টানা-টানি শুরু হয়।

ঝিনুক-শামুক-শুক্তি—সমুদ্রের এই সব খোলাওয়ালা প্রাণীরা এমনিতে ভীতু স্বভাবের হলেও এদেরই কেউ কেউ অবশ্য অন্য প্রাণীর শরীরে বিষ চালান করার দিব্যি ক্ষমতা রাখে। 'কোনাস গ্লোরিয়ামারিস' নামে একধরনের শাঁখ রাত্রি-বেলায় নিজেদের খোলসের ছুঁচলো আগাটা তাদের শিকারের গায়ে হারপুনের মতো বিঁধিয়ে দিয়ে বিষ ঢেলে দেয় আর তাতেই সামুদ্রিক কৃমি, ঝিনুক, শামুক এমনকি অক্টোপাসের বাচ্চারাও ঘায়েল!

শক্ত খোলা-ওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে কাঁকড়া বা গলদা চিংড়ী মানুষের প্রিয় খাদ্য হলেও—বাগে পেলে ওরাও মানুষকে ছাড়ে না। কোনও কোনও কাঁকড়া তাদের দাঁড়ায় যে বিপুল পরিমাণ শক্তি ধরে তা বোঝা যায় যখন আন্দামানের কোনও কোনও দ্বীপে কাঁকড়ারা নারকোলের নিরেট গায়ে ফুটো করে তার ভেতর থেকে শাঁস টেনে বের করে।

অগভীর উপকূলে, জলের নিচে সাগরতলে কাঁকড়াদের মতো ভীড় করে থাকে নানান জাতের 'সী-অ্যানিমোন' বা 'সাগর-কুসুম'। ফুলের মতো পাপড়ি মেলে বসে থাকলেও এরা প্রাণীগোত্রীয়; কোনটার চেহারা তারা'র মতো—নাম তাই এদের তারামাছ; কোনটার পাপড়িগুলো কদমফুলের মতো; কোনটাকে বা দেখতে লাগে ঠিক শশা'র মতো, আবার পাঁপড়ির বদলে কোন সাগরকুসুমের থাকে সজারু-কাঁটা। সাগরকুসুমদের পাঁপড়ি বা খোঁচাখোঁচা কাঁটার মধ্যেই থাকে বিষথলি; শিকার একবার নাগালের মধ্যে এলেই পাপড়িগুলো শিকারসুদ্ধ মুড়ে নিয়ে বিষথলি থেকে বিষ উজার করে দেয় সেই অসহায় প্রাণীটির শরীরে। এদের মধ্যে যে বিষ থাকে তা মানুষেরও হৃদযন্ত্র বিকল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

সামুদ্রিক মাছের কারো কারো অ্যালার্জী থাকে; সে মাছ খেলেই তাদের গা' চুলকোতে থাকে, অথবা গা-হাত-পা দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে। 'অ্যান্টি হিস্টামিন' জাতীয় ওষুধ খেলে অবশ্য অ্যালার্জীর উপসর্গগুলো মিলিয়ে যায়। আবার নদী-সাগরে এযাবৎ অন্ততঃ ৮০০ প্রজাতির মাছের খোঁজ মিলেছে যারা বছরের কোনও কোনও সময় রীতিমতো বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ঐসব মাছেরা যেসব শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ খায় তারাই বিষের আসল যোগানদার। টুনা, হেরিং জাতীয় যে সব মাছের চাহিদা গোটা পৃথিবী জুড়ে—সময়ে সময়ে তারাও এই দলে পড়ে।

এছাড়াও রয়েছে অন্তত ৭৫টি প্রজাতির মাছ যারা বেঁচে থাকার তাগিদে নিজেরাই বিষ-তৈরীর কৌশল রপ্ত করেছে অর্থাৎ, বিষগ্রন্থি তৈরি করে নিয়েছে নিজেদের শরীরে। এদের সবচেয়ে পরিচিত মাছটির নাম 'পাফার'।

ক্যাপটেন কুক তাঁর ১৭৭৪ সালের সমুদ্রযাত্রায় এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে এই মাছটির মারাত্মক গুণের কথা টের পান। ক্যাপটেন কুক-এর মাঝি মাল্লাদের জালে এই মাছটি উঠে আসতেই ওঁর নির্দেশে তার ছবি আঁকতে বসেন আর্টিষ্ট। আঁকতে আঁকতে বেলা গেলো; রান্নার আর সময় নেই দেখে জাহাজের পাচক এবং আর কয়েকজন মিলে মাছটার লিভারের খানিকটা অংশ তেলে ভেজে নিয়ে খেতে বসলেন, বাকী অংশটা দেওয়া হলো জাহাজেই বেঁধে রাখা এক শুয়োর-ছানাকে। পাফার-এর বিষক্রিয়া শুরু হলো যথাসময়ে। শুয়োর-ছানাটা মারা পড়লো পরদিন সকালে। জাহাজের পাচক এবং অন্য যাঁরা ঐ মাছ খেয়েছিলেন তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেও রীতিমতো ভুগতে হয়েছিলো তাঁদের।

মজার কথা, এই পাফার-ই আবার জাপানীদের অতি প্রিয় খাদ্য। জাপানে ঠাণ্ডা ঘরে মাছগুলোকে প্রায় ৩ থেকে ৪ বছর রেখে দেওয়া হয়। মাছেদের শরীরের 'টেট্রোডটোক্সিন' নামে বিষ খানিকটা নষ্ট হয়ে গেলে জাপানীরা এই মাছ রেঁধে খায়। জাপানীরা একে বলে 'ফুড-ফ্রাই'। ফুড-ফ্রাই খাওয়ার সাথে সাথে শরীর গরম হয়ে ওঠে, মাথা ঘুরতে থাকে। পাফার মাছ রান্না করার বিশেষ কায়দাটা অবশ্য শিখতে সময় লাগে। জাপানী রেস্তোরাগুলোকে ফুড-ফ্রাই বানানোর জন্য শুধুমাত্র সরকারী সার্টিফিকেট পাওয়া পাচকদেরই নিয়োগ করতে হয়।

বিষ নিয়ে কথা উঠলে সাপেদের ভুলে থাকা যায় না। সামুদ্রিক সাপেদের মধ্যে 'হাইড্রোফিডি' গোত্রীয় সাপেরা ডাঙগার গোখরো সাপের মতোই ভয়ঙ্কর। এযাবৎ এদের গোটা চল্লিশ প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। এদের চোখের পেছনদিকে মুখের ভেতর একজোড়া বিষগ্রন্থি থাকে। বিষগ্রন্থির বিষ আসলে একধরনের বিষাক্ত প্রোটিন এনজাইম।

কিছু কিছু প্রাণী আছে—'ভয়ঙ্কর' বলে যাদের বদনাম জুটেছে নেহাতই পাকেচক্রে। এদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে আগে অক্টোপাস-এর নাম করতে হয়। এই শান্তশিষ্ট প্রাণীটি সম্বন্ধে বলা হয়—মানুষকে একবার নাগালের মধ্যে পেলেই এরা নাকি নিজেদের আটটা শুঁড়ের সাহায্যে সেই মানুষটিকে জাপটে ধরে। সময়মতো বাঁচাতে না পারলে মানুষটিকে নিজের পেটের মধ্যে চালান করে অক্টোপাস।

ঘটনাটা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়; তবে এযাবৎ অক্টোপাসের মানুষ গিলে খাওয়া নিয়ে যে সব ঘটনার কথা বলা হয়েছে—তা সবই স্রেফ বানানো গল্প। বস্তুতঃ সাগর-জলের বাসিন্দাদের মধ্যে অক্টোপাসের মতো ভীতু এবং লাজুক প্রাণী আর হয় না। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো যে অক্টোপাসটি ধরা পড়েছে—শুঁড় ছড়িয়ে দেওয়া অবস্থায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি লম্বায় তা সাড়ে আট মিটার;
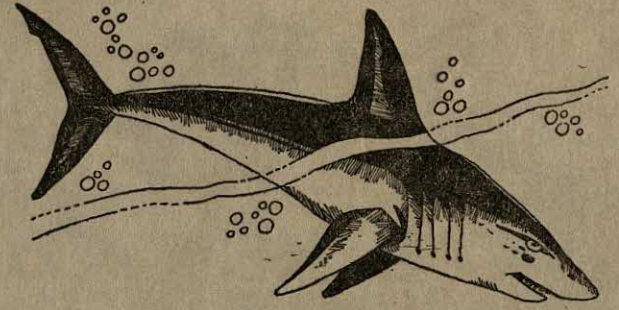
হাঙর সম্ভবতঃ সমুদ্রের সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী। কোনও কিছুতেই এদের অরুচি নেই। সমুদ্রের নিচুতলার বাসিন্দা হলেও খাবারের লোভে এরা উপকূলে হানা দেয়।
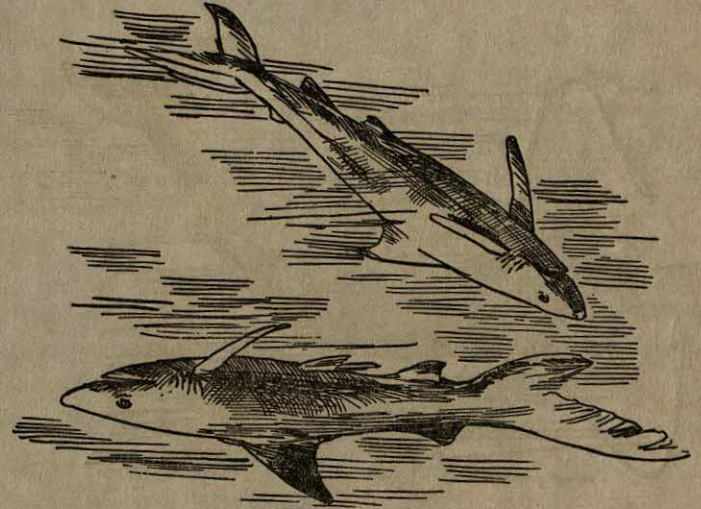
গ্রে-রীফ হাঙর (ছবিতে উপরে) হিংস্র প্রকৃতির হলেও ব্ল্যাক-টিপ্‌ড্ হাঙর (ছবিতে নিচে) রীতিমতো শান্ত স্বভাবের।
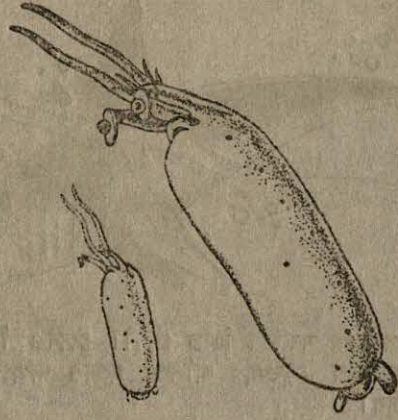
'স্যান্‌ডালপ'—এক ধরনের স্কুইড যারা অতলান্তিক মহাসাগরে ঘুরে বেড়ায়।
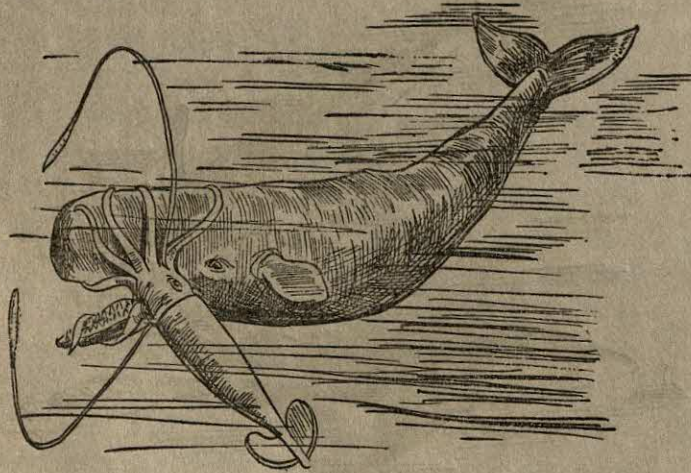
স্পার্ম তিমির সাথে অতিকায় স্কুইডের লড়াই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিমিরই জিৎ।

ঐ অক্টোপাসেরই মূল শরীরটা কিন্তু লম্বায় মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার!

অক্টোপাসের চেহারাটা বিকট হলেও আসলে এরা ঝিনুক-শামুকের সমগোত্রীয় কোমলাঙ্গ প্রাণী। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অক্টোপাসও এক সময় শক্ত খোলার ভেতর যে আশ্রয় নিতো তার প্রমাণ আছে জীবাশ্মের মধ্যে। বিবর্তনের পথে কোনও এক-সময় এরা খোলসটাকে পুরোপুরি বর্জন করে। একই ঘটনা ঘটেছে স্কুইড-এর বেলাতেও।

অক্টোপাসের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য—ওদের মতো অমন সুন্দর আর শক্তিশালী চোখ, প্রাণীজগতে মানুষ ছাড়া আর আর কারোর মধ্যে দেখা যায় না। অক্টোপাসের আটটা বাহু চলাফেরার সময় পায়ের কাজ করে। অক্টোপাসের কামড় খাওয়া রীতিমতো দুর্লভ ব্যাপার। তাকে মারাধরার ব্যবস্থা হচ্ছে এ অনুভূতি একবার হলেই সে প্রাণভয়ে পালাতে থাকে, অথবা আশ্রয় নেয় সাগরতলে পাথরের খাঁজে। একেবারে মরীয়া না হলে অক্টোপাস কখনই প্রতি-আক্রমণ করে বসে না। একটি প্রমাণ সাইজের অক্টোপাসের ৮টা পায়ে মোট ১৯২০টা শোষক-নল থাকে—প্রত্যেকটার ব্যাস কম বেশী ৬ মিলিমিটার। নলের মধ্যেকার বাতাস টেনে নিলেই শিকার আটকা পড়ে। শিকার বলতে অবশ্য নরম শরীর-ওয়ালা শামুক-ঝিনুকের মতোই প্রাণী।

অক্টোপাস যখন তার ঐ হাজার দুয়েক ছিদ্রপথে শিকারকে চুষতে থাকে—তার সেই বাঁধন ছাড়িয়ে পালানো শিকারটির পক্ষে তখন রীতিমতো দুঃসাধ্য। কাঁকড়া জাতীয় শক্ত খোলা-ওয়ালা শিকার পেলে অক্টোপাস তার টিয়া পাখীর মতো বাঁকানো ঠোঁটের সাহায্যে শিকারের খোলায় ফুটো করে বিষাক্ত লালা ঢেলে দেয় তার শরীরে। এর ফলে কাঁকড়ার মাংস-মজ্জা খানিকটা গলে যায়। সেই তরলকে তখন শুষে নিতে আর অসুবিধে কোথায়?

অক্টোপাস বহুরূপী। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ওরা

শরীরের রংও পাল্টায়। বিপদে পড়লে স্কুইড-এর মতো অক্টোপাসও কালি ছড়িয়ে দেয় জলে। শত্রুর চোখ এড়িয়ে পালানোর জন্য এ এক ভারি অদ্ভুত কায়দা।

কেবলমাত্র একধরনের অক্টোপাসের বিষ-ই মানুষের পক্ষে—প্রাণান্তকর। এরা হলো 'অক্টোপাস ম্যাকিউলোসাস'। অক্টোপাসেদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে সুন্দর। সারা গায়ে নীল বলয় আঁকা মাত্র ১০ সেন্টিমিটার লম্বা এই ক্ষুদে অক্টোপাসটির বিষাক্ত কামড়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা পড়তে পারে। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে—অগভীর জলে এদের দেখা মেলে।

এদের মতো মারাত্মক না হলেও, শত্রুকে জব্দ করতে এক মজার কায়দা বের করেছে 'কম্বল-অক্টোপাস'—যাদের পোষাকী নাম 'ট্রেমক্টোপাস'। 'পর্তুগীজ-ম্যান-অফ ওয়ার'-জাতীয় জল-ভর্তি প্রাণীদের হুলগুলোকে কেটে নিয়ে এই সব অক্টোপাসেরা নিজেদের শোষকনলের মধ্যে পুরে রাখে। শত্রুকে বাগে পেলেই তাকে জাপটে ধরে অস্ত্রের মতো হুলগুলো এরা বিঁধিয়ে দেয় তার গায়ে।

অক্টোপাসেরই জাতভাই হলো স্কুইড। আগেকার দিনে মানুষের ধারণা ছিলো, অক্টোপাস আর স্কুইড বুঝি একই প্রাণী। দৈত্যাকৃতি স্কুইডগুলি অক্টোপাসের তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক। এদের শুঁড়ের ব্যাস ৬০ সেন্টিমিটার; শুঁড়-গুলো লম্বায় ১৩ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। মাঝখানের তুলনায় দু'পাশের দুটো শুঁড় অনেক বেশী বড়ো। যুদ্ধের সময় শত্রুকে পেঁচিয়ে ধরতে এই শুঁড় দুটো কাজে আসে। এদের এক একটার ওজন ১৫০ টন পর্যন্ত হতে পারে। বাগে পেলে বড়সড় স্পার্ম-তিমিকেও এরা ঘায়েল করে ছাড়ে। সম্ভবতঃ তিমির বাচ্চাই এই সব দৈত্য-স্কুইডদের প্রধান এবং প্রিয় খাদ্য। জাহাজ থেকে জলে পড়ে যাওয়া একাধিক মানুষকে স্কুইড একসঙ্গে জলের তলায় টেনে নিয়ে গেছে—এমন নজীর কম না।

সাগরের প্রাণীদের মধ্যে হাঙরকেই মানুষের সবচেয়ে
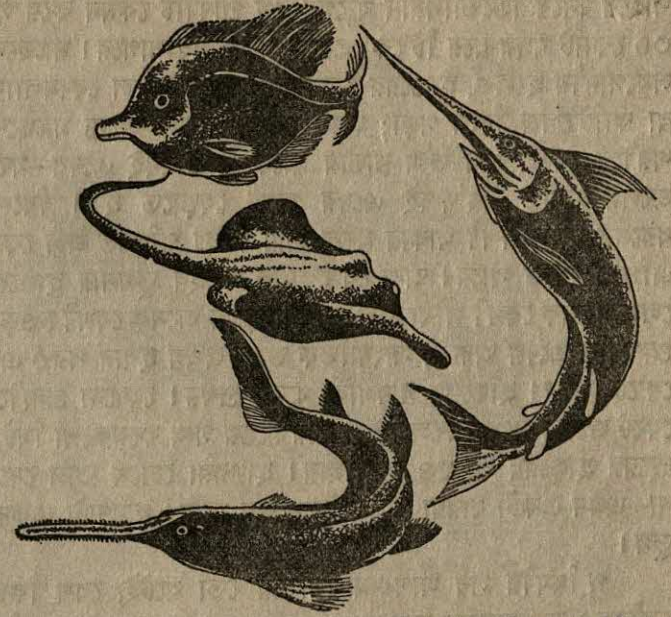
শিকার ধরা এবং আত্মরক্ষার জন্য মাছের শরীরের অংশবিশেষ অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। হলুদ সার্জন (ছবিতে সবার উপরে) মাছের শরীরে লুকনো থাকে ছুরির আকারের শক্ত হাড়ের টুকরো। 'স্টিং-রে'র পেছনের লম্বা ল্যাজে থাকে বিষ-থলি। করাত মাছ ও তরোয়াল মাছ তাদের অস্ত্রকে শত্রু নিধন ছাড়াও জলের নিচে বালি-মাটি খোঁড়াখুঁড়ির কাজে লাগায়।

বেশী ভয়। এর কারণ—গোটা প্রাণীজগতে একমাত্র হাঙরই বোধহয় বিনা প্ররোচনায় মানুষকে আক্রমণ করে এবং এযাবৎ জলজ প্রাণীদের মধ্যে হাঙরের কাছেই মানুষ ঘায়েল হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ছুঁচলো দাঁতের জোরালো কামড়ে মানুষের শরীরকে টুকরো টুকরো করে ফেলা এদের পক্ষে কঠিন নয়, এমনকি একটা প্রমাণ সাইজের মানুষকে হাঙর আস্ত গিলে ফেলেছে—এমন ঘটনাও বহুবার ঘটেছে।

হাঙরের শারীরিক গঠন এবং আচার-আচারণ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়—পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ

খাইয়ে নিয়ে ডিভোনিয়ান যুগের এই প্রাণীটি কেমন করে গত ৩০ কোটি বছর ধরে টিঁকে রয়েছে সাগর-মহাসাগরে। মাছেদের সমগোত্রীয় হলেও, হাঙরের শরীরটা হাড়ের বদলে কোমলাস্থি বা কার্টিলেজ দিয়ে গড়া; জলে ভেসে থাকার জন্যে মাছেদের শরীরে যে হাওয়া ভরা ব্লাডার থাকে তাও নেই এদের—ফলে জলের মধ্যেও সর্বক্ষণই এদের ছুটে বেড়াতে হয়। বিশেষ ধরনের মাংসপেশী থাকার ফলে এরা ক্ষিপ্র গতিতে জল কেটে এগিয়ে যেতে পারে। অন্য যে কোনও মাছের তুলনায় হাঙরের লেজ অনেক বেশী লম্বা এবং পাখনাগুলো অনেক বেশী চওড়া। প্রাণশক্তি এদের অদম্য; সাংঘাতিক ভাবে জখম হবার পরও এরা বেঁচে থাকে। হাঙরের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রখর। কোনো প্রাণীকে কেটে জলের মধ্যে ফেলে দিলে তার রক্তের গন্ধ কয়েকশো মিটার দূরের হাঙরের কাছেও পেঁাছোয়। হাঙররা চোখে ভাল দেখে না—এমন একটা ধারণা আছে অনেকের মধ্যে। ধারণাটা একদম ভুল।

পৃথিবীর সব সাগর-মহাসাগরে তো বটেই, বেশ কিছু নদীতেও নানাজাতের হাঙরের দেখা মেলে। সুমেরু এবং গ্রীণ-ল্যান্ড অঞ্চলের বরফ-ঠান্ডা জলে এদের খোঁজ মিললেও মূলতঃ সেই সব জায়গাই এদের পছন্দ, যেখানে জলের উষ্ণতা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশী। এদের প্রায় আড়াইশো প্রজাতির মধ্যে কিছু কিছু রীতিমতো শান্ত প্রকৃতির। আমেরিকার পূর্ব উপকূলে 'ডগফিশ' নামে যে ছোটজাতের হাঙর দেখা যায় তারা
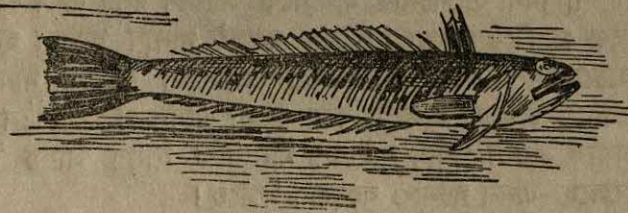
'ট্রাচিনাস ড্রাকো'—এদের শিরদাঁড়ার গায়ে বিষভর্তি থলি থাকে। সাধারণতঃ এরা গভীর জলে থাকে।

কখনো কোনও সাঁতারুর ক্ষতি করেছে বলে শোনা যায়নি। আবার হাঙরদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে 'শার্ক হোয়েল'—বিশালত্বের দিক থেকে প্রাণীজগতে যার জায়গা 'তিমি'র পরেই—তারাও সাধারণতঃ নিরীহ প্রকৃতির। বিশেষজ্ঞদের মতে—হাঙরের গোটা ১২ জাত-ই খুনে স্বভাবের। লম্বায় এরা দেড় মিটার থেকে ৭ মিটারের মধ্যে।

হিংস্রতায় সবাইকে টেক্কা দেয় 'সাদা হাঙর', নাবিকরা এর নাম দিয়েছে 'সাদা শয়তান'। শরীরটার ওজন প্রায় ৪ টন হওয়া সত্ত্বেও এরা অবিশ্বাস্য গতিতে জলের মধ্যে ছুটে বেড়ায়। সাদা হাঙরের জ্ঞাতি হলো 'ম্যাকো-হাঙর' আর হাতুড়ির মতো মাথা ওয়ালা 'হ্যামার-শার্ক'। 'নীল-হাঙর'ও ওদেরই সগোত্র; এদের পেটের দিকটা ধবধবে সাদা হলেও পিঠের রং ঘন নীল। খুনে স্বভাবের দিক থেকে এরা কেউ কারো চেয়ে কম যায় না।

সমুদ্রের ধারে যারা বেড়াতে যায়—সাগরের জলে স্নান করার সময় তারা যাতে হাঙরের শিকার না হয় সেই উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ার 'সিডনী'র সমুদ্রসৈকত থেকে খানিকটা দূরে সমুদ্রকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় ১৯৩৭ সালে। সেই জালে ধরা পড়লো ১৫০০ হাঙর—যার মধ্যে অন্ততঃ ৯০০টা হলো মানুষ খেকো। এরপর থেকেই সিডনীর উপকূলে হাঙরের আনাগোনা বন্ধ। সমুদ্রের স্নানার্থীরা যাতে বিপদে না পড়ে তার জন্য সমুদ্রসৈকতগুলিকে জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার এই ব্যবস্থা এখন চালু হয়েছে বহু দেশে।

মাঝসমুদ্রে হাঙরকে রোখার কোনও উপায় নেই বললেই চলে। উদাহরণ হিসেবে বলি—১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় 'নোভাস্কটিয়া' নামে এক যুদ্ধজাহাজ শত্রুপক্ষের টর্পেডোর ঘায়ে জলে ডুবে গেলে প্রায় হাজার খানেক মাঝি-মাল্লা-সেপাই জলে পড়ে যায়। পরের দিন সকালে মানুষগুলোর 'পা-কাটা' শরীর ভেসে ওঠে জলের উপর। একজনও বাঁচেনি ওদের মধ্যে।

হাঙররা সর্বভূক। সমুদ্রের প্রায় যাবতীয় প্রাণী ছাড়াও,

মানুষ, পাখী, আবর্জনা—এমনকি কয়লাও পাওয়া গেছে এদের পেটের মধ্যে। কোনও কিছু চিবিয়ে খাওয়ার ফুরসৎ নেই এদের; যা পায় তাই কামড়ে টুকরো করে নিয়ে চালান করে পেটের মধ্যে।

এদের কেউ কেউ আবার শিকারকে প্রায়-অবিকৃত অবস্থায় পেটের মধ্যে ধরেও রাখতে পারে। ১৯৩৫ সালে একবার তো অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ধরা পড়লো গায়ে ডোরা কাটা দাগ-ওয়ালা 'বাঘা-হাঙর'। অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে দিন আষ্টেক রেখে দেওয়ার পর হাঙরটা একদিন উগরে দিলো মানুষের একটা হাত; হাঙরের পেটের মধ্যে ৮ দিন ধরে থাকার **পরও** সেই হাতের গায়ে উল্কি চিহ্নগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেলো—হাতটাকে তার মালিকের শরীর থেকে ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ মানুষটিকে খুন করা হয়েছে। সেই হাত-এর উপর উল্কি চিহ্নগুলি থেকে খুন হওয়া মানুষটির খোঁজ পায় পুলিশ এবং যথাসময়ে সে খুনের কিনারা হয়। খুনী-হাঙর আর একজন খুনী-মানুষকে ধরিয়ে দিয়েছে—এমন ঘটনা বোধহয় আর কখনো ঘটেনি।

বড়োসড়ো সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে হাঙরের মতো আর কেউ সাধারণতঃ মানুষের বিপদ ঘটায় না। স্কুইড বা তিমিরা মানুষের কাছাকাছি কখনোই আসে না। হাঙরের মতোই বিকট-দর্শন আর এক মাছ—'মান্টা রে'; কোথাও কোথাও এর নাম শয়তান মাছ। মজার কথা, সবচেয়ে বড়ো জাতের হাঙর—শার্ক-হোয়েলের মতো এরাও নিরীহ প্রকৃতির এবং এদেরও প্রধান খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন আর অন্যান্য ক্ষুদে জলজ প্রাণী।

করাত আর তরোয়াল-মাছের অস্ত্র তাদের লম্বা নাক যার কোনটা তরোয়ালের মতো ছুঁচলো, কোনটা বা করাতের মতো খাঁজ কাটা। শিকারকে ঘায়েল করতে তো বটেই, সময়ে সময়ে জলের তলায় বালি খুঁড়ে খাবারের খোঁজ করতেও এই অস্ত্র ওদের খুবই কাজে আসে।

সামুদ্রিক মাছেদের মধ্যে হাঙরকে বাদ দিলে আর যেটি
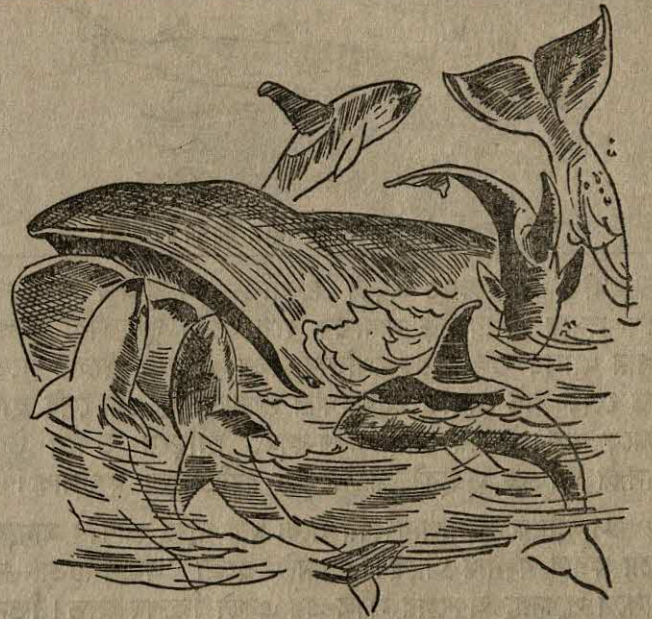
একপাল নেকড়ের মতো খুনে তিমির ঝাঁক যখন প্রকাণ্ড স্পার্ম অথবা নীল তিমিদের আক্রমণ করে তখন তাদের অবস্থা হয় সঙ্গীন।

মানুষের কাছে রীতিমতো বিপজ্জনক—তার নাম 'ব্যারাকুডা'। ফ্লোরিডা অথবা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উপকূলে যে সব ডুবুরীরা সমুদ্রের সম্পদের খোঁজে জলে ডুব দেয়—তারা হাঙরের চেয়েও বেশী ভয় পায় এক থেকে দু'মিটার লম্বা চুরুট-আকৃতির এই রোগাটে মাছটিকে। এর কারণ, ওখানকার খাড়ি অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত গরম জলে হাঙরের তুলনায় ব্যারাকুডা'র সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। ঠিক আক্রমণ না করলেও খানিকটা কৌতুহলের বশেই যেন এরা সুযোগ পেলেই সাঁতারুদের ধাওয়া করে। মানুষকে যখন এরা আঘাত করে—তখন তার গায়ে লম্বালম্বি একটাই মাত্র গভীর ক্ষত রেখে যায়; শত্রুকে ঘায়েল করতে হাঙরদের মতো বার বার এরা ফিরে আসে না।
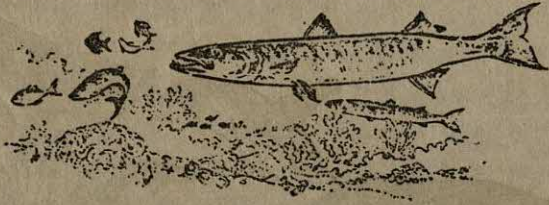
ব্যারাকুডা—কৌতূহলই যাকে হিংস্র আখ্যা দিয়েছে।

'ঈল' মাছেদেরও একটা প্রজাতি—'মোরে-ঈল' মানুষের পক্ষে সময়ে সময়ে বড় মারাত্মক হয়ে ওঠে। ডুবুরীরা জলের তলায় বালির তলায় রত্ন খোঁজার সময় একবার ঈলের গর্তে হাত ঢোকালেই নেহাত আত্মরক্ষায় প্রয়োজনেই ওরা সেই হাত কামড়ে ধরে। ঈলের সেই মরণ-কামড় ছাড়িয়ে উপরে উঠে আসাটা অভিজ্ঞ ডুবুরীদের পক্ষেও রীতিমতো কষ্টসাধ্য।

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মাত্র দুটি প্রাণীর মানুষ-হত্যা করার বদনাম আছে। প্রথমটা হলো 'সমুদ্র-চিতা'—যা আসলে সুমেরু অঞ্চলের সীল-এর একটা বিশেষ জাত। তিন-সাড়ে তিন মিটার লম্বা এই প্রাণীটি সাধারণতঃ ছোট মাপের শিকার ধরলেও এরা যে গরম রক্তের প্রাণী খেতে পছন্দ করে, তার বেশকিছু নজির রয়েছে।

তিমিদের একটা প্রজাতিকে বিপজ্জনক বলে অনেকে মনে করেন। প্রায় ৯ মিটার লম্বা এই 'খুনে-তিমি'র বাস মেরু অঞ্চলের আশপাশের সমুদ্রে। অনেকের ধারণা—এযাবৎ এস্কিমোদের অনেকেই এই দুটি প্রাণীর শিকার হয়েছে—যদিও সভ্য মানুষের কাছে এর নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই।

'সমুদ্র-চিতা' আর 'খুনে-তিমি'রা মানুষের ক্ষতি করুক আর নাই করুক, সমুদ্রের স্তন্যপায়ীদের নিধন করার জন্য খোদ মানুষই যে হিংস্র যজ্ঞ চালিয়ে আসছে তা এককথায় নজিরহীন। এই মারণযজ্ঞে এযাবৎ প্রাণ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ সীল আর তিমি। এখন থেকে বেশ কয়েক কোটি বছর আগে উষ্ণ রক্তের কোনও কোনও প্রাণী যে সত্যিই ডাঙগা থেকে সাগরে নেমে গিয়েছিলো বসত গড়তে 'সীল'দের দেখলে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ডাঙগার প্রাণীদের সঙ্গে এদের মিল লক্ষ্য করেই মানুষ এদের কোনটার নাম দিয়েছে 'সাগর-সিংহ', কোনটার নাম দিয়েছে 'সাগর-গরু', কোনটার বা 'সাগর-চিতা'। সীল-এর এক বিশেষ প্রজাতি—'সাগর-হাতী'র ছোট্ট একটু শুঁড়ও রয়েছে নাকের উপর। 'সাগর-ভোঁদড়'দের তো দিব্যি দু'টো পা রয়েছে—ডাঙগার প্রাণীর মতো। চামড়া-মাংস-আর চর্বির লোভে সীল-এর কোনও জাতকেই অবশ্য রেহাই দেয়নি মানুষ।

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের মধ্যে 'তিমি'র প্রতিই মানুষ যে সবচেয়ে বেশী নির্দয় ব্যবহার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তিমিদের সকলেই যে বিশালাকায়, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। স্পার্ম-তিমি, খুনে-তিমি, এরা সব ছোট মাপের; লম্বায় ১০ থেকে ১৮ মিটার। ডলফিন বা শুশুকরাও এদের দলে পড়ে। আবার 'নীল-তিমি' শুধু তিমিদের মধ্যেই নয়—পৃথিবীর সব যুগের সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। এযাবৎ সবচেয়ে বড়ো যে 'নীল-তিমি' ধরা পড়েছে, লম্বায় সেটা প্রায় ৩২ মিটার; ওজন—আন্দাজ ১৭০ টন।

তিমিদের এইসব হরেক প্রজাতি, মায় নীল তিমি পর্যন্ত মানুষের ভয়ে সমস্ত সাগর মহাসাগর ফাঁকা করে শুধুমাত্র দক্ষিণ-মেরু সমুদ্রে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে—তিমি-শিকারীরা শুধু সেবছরই মোট ২৭,১২৮টি তিমিকে হত্যা করে। তিমিদের বাঁচানোর জন্য বহু দেশ আইনজারি করলেও, তিমির সংখ্যা প্রতিবছরই অবিশ্বাস্য হারে কমে যাচ্ছে।

অবস্থাটা যদি না পাল্টায়, আচার-আচারণে সত্যি সত্যি ভয়ংকর না হয়েও মানুষের হাতে তিমি'রা যদি এমনিভাবে সাজা পেয়ে চলে—তবে পৃথিবীর এই বিশালতম প্রাণীটি যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই গ্রহ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেবে তাতে সন্দেহ নেই।

বারো

উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে যখন পানামা খাল কাটার প্রথম পরিকল্পনা নেওয়া হল, তখন 'গেল-গেল' রব করে উঠেছিলো ফরাসীরা। তখন ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, পানামা খাল দিয়ে অতলান্তিককে যদি প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় তবে অতলান্তিকের তলা দিয়ে যে গরম জলের স্রোত বয়ে যায়, যা ইয়োরোপের আবহাওয়াকে গরম রাখে, তা সোজা ঐ খাল ধরে চলে যাবে প্রশান্ত মহাসাগরে। ফলে, শীতের সময় ইয়োরোপে আরও বেশী করে বরফ পড়বে; ঠান্ডায় একেবারে জমে যাবে ওখানকার মানুষ! মার্কিনীরা অবশ্য ওসব কথায় কান না দিয়ে খাল কেটে গেছে এবং ফরাসীদের আশংকাটা যে নেহাতই অমূলক ছিলো তাও ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তবে একটা কথা না মেনে উপায় নেই—পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমুদ্রের যে একটা বড়ো ভূমিকা আছে, সেটা ফরাসীরা ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন।

আবহাওয়ার আনুকূল্যে সূর্যের গ্রহপরিবারের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের বিকাশ যেমন ঘটেছে—তেমনি বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় পৃথিবীর কোথাও কোথাও প্রাণীকুল লোপ পাওয়ার ঘটনাও আমাদের অজানা নয়।

প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর এই আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে কে? এক কথায় উত্তর—সূর্য। সূর্য তো কেবলমাত্র আমাদের এই গ্রহটির জন্মদাতাই নয়, এখানকার যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়ন্ত্রকও বটে। কিন্তু কথাটাতো অন্য গ্রহগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; তাহলে কেন পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণধারণের উপযোগী আবহাওয়া তৈরী হলো না?

এর উত্তরটা খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞানীদের নজর পড়েছে সমুদ্রের দিকে, এবং বিস্তর গবেষণার পর ওঁদের দৃঢ় ধারণা,—সমুদ্র না থাকলে আমাদের এই গ্রহে কোনদিনই অক্সিজেন সমৃদ্ধ আবহমণ্ডল গড়ে উঠতো না। সমুদ্র থেকে যে জলীয় বাষ্প উঠে আসে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবেই তা ভেঙে যায় হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে। হাল্কা হাইড্রোজেন পৃথিবীর টান কাটিয়ে ছুট্ লাগায় মহাকাশে, আর অপেক্ষাকৃত ভারী অক্সিজেন—যার আর এক নাম 'প্রাণবায়ু', তা নিচে নেমে বাতাসকে সমৃদ্ধ করে। এই ঘটনাই ঘটে চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে।

শুধু অক্সিজেনের যোগান বাড়ানোই নয়, বাতাসে কার্বন-

ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমাতেও সমুদ্রের ভূমিকা অনন্য। এই শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস আর জ্বালানী তেল পোড়ানোর ফলে গড়পড়তা প্রতি বছর ২০০ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরী হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে এসে মিশলে প্রতিবছর বাতাসে তার পরিমাণ আধ-শতাংশ করে বেড়ে যাওয়ার কথা।

কার্যতঃ তা যে হচ্ছে না তার জন্য সমুদ্রের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকার কথা আমাদের। সমুদ্রের জল বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটা বড় অংশ শুষে নেয় বলেই তো বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি এখনও মারাত্মক হয়ে ওঠে নি।

জলের একটা মস্ত গুণ হলো—বিপুল পরিমাণ তাপ সে ধরে রাখতে পারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ বাতাসকে ১° গরম করতে যতটা তাপ লাগে, ঐ একই পরিমাণ জলকে ১° গরম করতে তার তুলনায় ৩০০০ গুণ বেশী তাপ প্রয়োজন। পৃথিবীর উপর প্রতিমুহূর্তে যে সৌরতাপ এসে পেঁছোয় তার বড় অংশটাকে সমুদ্রের জল ধরে রাখে বলে আবহওয়ার উষ্ণতা যেমন সীমা ছাড়ায় না তেমনি শীতের দিনে সমুদ্র জল থেকে সঞ্চিত তাপ ছড়িয়ে পড়ে বলেই পৃথিবীর প্রাণীজগৎ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে বেঁচে যায়।

শুধু অতিরিক্ত ঠাণ্ডা গরমের হাত থেকে বাঁচানোই নয়, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে বৃষ্টি— তাও মেলে ঐ সমুদ্রেরই কল্যাণে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে জলীয় বাষ্প প্রতিনিয়তঃ এসে বাতাসে মেশে। গোটা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র থেকে বছরে গড়পড়তা ১ মিটার করে জল বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে উড়ে যায়; সমুদ্রের ঐ জলীয় বাষ্পই মহাদেশ-গুলির মাথায় মেঘ হয়ে জমাট বেঁধে বৃষ্টি ঝরায়। সমুদ্রের ঢেউ যে নুন বয়ে আনে সাগর পাড়ে, তাই আবার বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে জলীয় বাষ্পকে দানা বাঁধতে সাহায্য করে। জমাট-বাঁধা জলকণাই তখন বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে পৃথিবীতে। সমুদ্রে জলের বাষ্পায়নে হেরফের ঘটলে বৃষ্টিপাতেরও তারতম্য হয়।

সমুদ্রের পাশাপাশি যে কোনও দেশের ভৌগোলিক গঠনের উপরও সে দেশের আবহাওয়া নির্ভর করে। যেমন, বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসা জোলো বাতাসের কল্যাণে আমাদের গাঙ্গেয় বাংলায় গ্রীষ্মের দিনগুলোয় যে কাল-বোশেখীর ঝড়বৃষ্টি হয়, তার পেছনে বাংলার উত্তর পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমিরও বিরাট ভূমিকা আছে। চৈত্র-বৈশাখে ছোটনাগপুর অঞ্চলের তাপমাত্রা চড়চড় করে বাড়তে বাড়তে ৪৫°-৪৬° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। গাঙ্গেয় বাংলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের জলো বাতাস তখন ছোটনাগপুর অঞ্চলের গরম বাতাসকে দেয় ধাক্কা। সেই গরম বাতাস তখন চিমনীর ধোঁয়ার মতো সোঁ করে উঠে যায় উপরে; ঠাণ্ডা বাতাসের জলীয় বাষ্প তুলনায় হাল্কা বলে, গরম বাতাসের সাথে তাও উঠতে থাকে উপরে।

ঐ গরম জোলো বাতাস যতই উপরে উঠতে থাকে চার-পাশের ঠাণ্ডা পরিবেশ ততই তার তাপ শুষে নেয়—ফলে সেই গরম বাতাস ঠাণ্ডা হতে থাকে ক্রমশঃ। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পেঁছে তার জলীয় অংশ জমাট বেঁধে জলকণার রূপ নেয়। এরই নাম কালবোশেখীর মেঘ।

আবহাওয়ার ধরনধারণ যে সমুদ্রের উপর কতটা নির্ভর-শীল তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায় ঘূর্ণিঝড়ের সময়। নিরক্ষরেখার দু'পাশে ১০° থেকে ২০° অক্ষাংশের মধ্যে উষ্ণ সমুদ্রে এই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমুদ্রজলের তাপমাত্রা নিদেনপক্ষে ২৭° সেলসিয়াস হওয়া চাই।

দেখা গেছে গ্রীষ্মমণ্ডলের যে অংশ উত্তর গোলার্ধে সেখানকার বাতাস বয় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। গ্রীষ্মমণ্ডলের যে অংশ দক্ষিণ গোলার্ধে সেখানে ঘটে এর ঠিক উল্টোটা। বাতাস সেখানে বয়ে আসে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে। এই

দু'ধরনের বাতাসের মাঝখানে থাকে শান্ত বাতাসের একটা স্তর। সমুদ্রের উপর ঐ শান্ত বাতাসের মাঝখানে কিছু দুর্বল জায়গা থাকে যেখানকার ভারী জলো বাতাস ক্রমশঃ গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। স্বভাবতঃই তার খালি জায়গাটা ভরাট করতে ছুটে আসে আশপাশের বাতাস। পৃথিবী যেহেতু তার অক্ষের চার দিকে অবিরাম ঘুরে চলেছে—যার ফলে আশে-পাশের সেই বাতাস সরাসরি এসে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছতে পারে না, তার বদলে সাপের কুণ্ডলীর মতো পাক খেতে থাকে ঐ শান্ত জায়গার চারপাশে। সেই বাতাসই ঘুরপাক খেতে খেতে কি করে বিরাট ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নিয়ে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসে তা এখনও অবশ্য রহস্যই রয়ে গেছে।

পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মহাসাগরীয় স্রোতের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সাগরের জল কোন জায়গাতেই স্থির নেই। পশ্চিম মুখো বাতাসের ঠেলায় প্রতি-নিয়তঃ এক মহাসাগরের জল অন্য মহাসাগরে গিয়ে মিশছে, পাড়ি দিচ্ছে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে।

১৮৯৯ সালে আলাস্কার উপকূলে সমুদ্রে একটা বোতলে বার্তা ভরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। ঢেউ-এর উপর ভাসতে ভাসতে প্রায় ছ'বছর বাদে ৪০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সেই বোতল আইসল্যাণ্ডের উপকূলে গিয়ে হাজির হয়।

আবার ১৮৫৬ সালে 'গ্রিফনেট' জাহাজের নাবিকরা বিস্‌কে উপসাগরের একটা ছোট্ট দ্বীপে তাদের জাহাজ মেরামত করার সময় ঐ দ্বীপেরই গায়ে কতকগুলি পাথরের খাঁজে একটা পিপে খুঁজে পান। পিপেটার মধ্যে পাওয়া গেলো আলকাতরা মাখানো একটা নারকেল; ঐ নারকেলের মধ্যে ছিলো গথিক-লিপিতে লেখা একটা পার্চমেন্ট কাগজ।

আসলে ঐ লিপিটা ছিলো ক্রিস্টোফার কলম্বাসের লেখা একটা খবর। স্পেনের রাজা এবং রানীকে পাঠানো ঐ কাগজে কলম্বাস লিখেছিলেন—কেমন করে 'সান্তা মারিয়া' জাহাজটা হারিয়ে যায় এবং তাঁর নৌবহরের স্পেনীয় মাঝিরা বিদ্রোহ শুরু করে। কলম্বাসের লেখা সেই কাগজ পিপের মধ্যে দুলতে দুলতে এক সাগর থেকে অন্য সাগরে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং তীরভূমিতে শুয়ে থেকেছে ৩৫৮ বছর ধরে!

সমুদ্রের তলা দিয়ে বয়ে চলে এমন স্রোতধারার সঙ্গেও নৌযাত্রীরা বহুকাল ধরে পরিচিত। ১৫১৩ সালে পন্স-ডি-লিঁয়োন নামে এক স্পেনীয় নাবিক অতলান্তিক পাড়ি দিতে

মহাসাগরীয় স্রোত

...........→ ঠাণ্ডা জলের স্রোত
———→ গরম জলের স্রোত

A উপসাগরীয় স্রোত (গরম)
B ল্যাব্রাডর স্রোত (ঠাণ্ডা)
C ক্যানারী স্রোত (ঠাণ্ডা)
D উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত (গরম)
E দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (গরম)
F বেঙ্গুয়েলা স্রোত (ঠাণ্ডা)
G দক্ষিণ মেরুসাগরীয় স্রোত (ঠাণ্ডা)
H ব্রাজিল স্রোত (গরম)
J হামবোলড্‌ স্রোত (ঠাণ্ডা)

গিয়ে ফ্লোরিডা স্রোতপ্রবাহে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সেটা এতো শক্তিশালী ছিলো যে সেই স্রোতকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর পালতোলা জাহাজের ছিলো না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন বাণিজ্যতরীর নাবিকরা অতলান্তিকের তলায় উপসাগরীয় স্রোতের প্রথম খোঁজ পায়। তারা আমেরিকা থেকে ব্রিটেন যাবার পথে এই স্রোতের সাহায্য নিতো, আবার ঘরে ফিরে আসার সময় এই স্রোতকে এড়িয়ে চলতো। সেইসময়েই নাবিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সমুদ্রের মানচিত্রে উপসাগরীয় স্রোতের গতিপথ চিহ্নিত করে দেওয়া হয় এবং জানানো হয়, এই শক্তিশালী স্রোতটা নাকি আসলে অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা বিশাল এক নদীর মতো। সমুদ্রের তলায় অদৃশ্য এই নদী সমুদ্রের নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে গরম জল বয়ে নিয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে, এইসব মহাসাগরীয় স্রোত প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ জল পরিবহন করে তা ভূ-মণ্ডলের সবগুলো নদীর জল এক করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে তার চাইতেও ২৫ গুণ বেশী! প্রশান্ত মহাসাগরের 'কুরোশিয়ো স্রোত' জাপানী উপকূলকে এবং অতলান্তিকের 'উপসাগরীয় স্রোত' দক্ষিণ আমেরিকা আর উত্তর ইয়োরোপের উপকূলভাগকে ছুঁয়ে যায়; ঐসব অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে মহাসাগরীয় স্রোতগুলিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

সমুদ্র জলের উষ্ণতায় হেরফের ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরাট প্রভাব পড়ে গোটা পৃথিবীতে। গত ৮২-৮৩ সালে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণের দেশগুলো—ভারত, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়ার জাভা বা দক্ষিণ ফিলিপিনের দ্বীপগুলো অভূতপূর্ব খরার কবলে পড়েছিলো। আবার ঐ একই সময়ে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় ভেসে গেছে; একটানা ঝড়বৃষ্টিতে কয়েক লক্ষ মানুষ নাকি গৃহহারা হয়ে পড়েছিলো।

পৃথিবীর এইসব দেশের আবহাওয়ার এই যে অস্বাভাবিক আচরণ এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে 'এল্ নিনো' নামে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা গরম অংশকে।

স্প্যানিশ ভাষায় 'এল নিনো' বলতে বোঝায় 'বাচ্চা'। কয়েক বছর পর পর 'বাচ্চা'র ঘুম ভাঙে; প্রশান্ত মহাসাগরের ঐ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলরাশি খানিকটা রহস্যজনক ভাবেই হঠাৎ বেশ গরম হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক কালে এমনটা আর হয়েছিলো ১৯৭২ আর ১৯৭৬ সালে। 'এল নিনো' জন্ম নেওয়ার ফলে পেরুতে বৃষ্টিপাত হয়েছিলো অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশ কয়েকগুণ বেশী। এর কারণ, হঠাৎ করে সমুদ্র উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে ইকুয়েডর ও পেরুর উপকূলভাগে জলের উষ্ণতা ৩° থেকে ৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যায়। তখন থেকে জলীয় বাষ্প সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে না এসে গরম বাতাসকে সঙ্গী করতে থাকে। সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে আসা গরম বাতাস ভূখণ্ডে এসে আরো গরম হয়ে ওঠে তারপর যতই তা পাহাড়ের গা' বেয়ে উপর ওঠে ততই ঠাণ্ডা হয় এবং মেঘের আকারে মাথার উপর জমতে থাকে। ঊষর মরুতে শুরু হয় একটানা বৃষ্টিধারা। অবিরাম বৃষ্টির ফলে পেরুর উপকূল ভাঙে; আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত গরম হয়ে ওঠার ফলে সামুদ্রিক মাছের ঝাঁক পেরুর উপকূল ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে।

'এল নিনো'র স্বভাবটা খানিকটা পেটুকের মতো—কিছুতেই যেন আর খিধে মেটে না। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট একটু জায়গায় এর জন্ম হলেও যত দিন যায় ততই এ ছড়িয়ে পড়ে; ১৯৮২-৮৩ সালের 'এল নিনো' গোটা মহাসাগরটার তিনভাগের একভাগ জায়গা দখল করে নেয়। সমুদ্রের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জল হঠাৎ করে গরম হয়ে ওঠার ফলে বাতাসের গতিপথ পাল্টায় এবং বিভিন্ন দেশে তার চাপেরও হেরফের হয়। সম্ভবতঃ এরই ফলে আবহাওয়ায় ওলটপালট দেখা দেয় দেশে দেশে। ১৯৮২-৮৩ সালে ভারত

মহাসাগরে জলের তাপমাত্রা যে স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়েছিলো তার প্রমাণ আছে। সেদিক থেকে দেখলে, ভারত বা আফ্রিকার দেশগুলোয় তখন যে অভূতপূর্ব খরা দেখা দিয়েছিলো তার সঙ্গে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের ‘এল নিনো’র সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত কি?

সমুদ্র এবং বাতাসের পারস্পরিক ক্রিয়ার সাথে পৃথিবীর আবহওয়ার সম্পর্কের কথায় ফিরে আসি। সাইবেরিয়ার ঠান্ডা বাতাস নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় সূর্য-কিরণে গরম হয়ে ওঠা সমুদ্রের জল থেকে তাপ টেনে নেয়। সেই গরম জলো বাতাসই এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঝড়-জল ডেকে আনে।

সমুদ্রের বুকে যে ঢেউ জাগে—তার আকৃতি আর চরিত্রও নির্ভর করে সমুদ্র আর বাতাসের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর। সাগরজলের উষ্ণতার হেরফেরে জলের উপর বাতাসের চাপের পরিবর্তন ঘটে; জলের উপর বাতাসের চাপ-ই ঠিক করে দেয় ঢেউ কতটা উঁচু হবে অথবা কি গতিবেগে তা ছুটে যাবে উপকূলের দিকে।

সত্যি বললে, অল্পদিন হলো এইসব বিষয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সমুদ্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই হাল আমলে সাগর-মহাসাগরের বুকে গড়ে উঠেছে অজস্র আবহ-কেন্দ্র। এইসব কেন্দ্রের আবহ-বিজ্ঞানীরা দিনরাত নজর রাখছেন সমুদ্রের দিকে; সমুদ্রের চরিত্র বদলানোর সাথে সাথে তার কতটা প্রভাব আবহমণ্ডলের উপর পড়ছে সে ব্যাপারে তত্ত্ব-তালাশ করছেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রের সাথে আমাদের চেনা-পরিচয়টা আরও গাঢ় হবে। তাতে পৃথিবীর সব দেশেরই আবহাওয়ার পূর্বাভাসটা এখনকার তুলনায় অনেক বেশী নিখুঁত হবে এবং সেই-সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আবহাওয়ার যে রূপবদল ঘটে তা আমরা জানতে পারবো। জানতে পারবো, কেন মানুষকে চার-চারটে তুষার যুগকে সহ্য করতে হয়েছে; কেনই বা সাগর-মহাসাগর আর মহাদেশকে নিয়ে আমাদের এই পৃথিবী আগের তুলনায় আজ ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছে; কেনই বা অদূর ভবিষ্যতে এক জগৎজোড়া মহাপ্লাবনের আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তেরো

খাবারের খোঁজে সাগরে
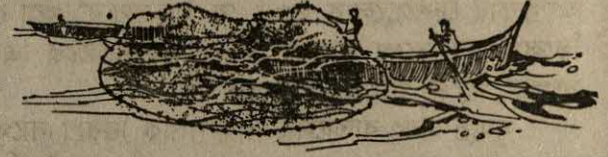
ভদ্রলোকের নাম থমাস্ রবার্ট ম্যালথাস, জাতে ইংরেজ, পেশায় অর্থনীতিবিদ্। এহেন ভদ্রলোকটি ১৭৯৮ সালে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর এক লম্বা চওড়া প্রবন্ধ লিখলেন, যা পড়ে তখনকার দিনের লোকেদের মধ্যে বলতে গেলে হাসা-হাসি, টিটকিরিই শুরু হয়ে গেলো—দূর, দূর ম্যালথাস্-এর মাথাটাই একেবারে বিগড়ে গেছে! না হলে কেউ লেখে নাকি, মানুষ একদিন পৃথিবীর সমস্ত জমি চাষ করেও খাদ্যের অভাব মেটাতে পারবে না! কারণ যে হারে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় মানুষের সংখ্যা বাড়ে তার চেয়ে ঢের বেশী হারে।

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে ম্যালথাস সাহেবের কথাগুলো অনেকেই বিশ্বাস করে নি। আসলে, গোটা পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা তখন আজকের ভারতের লোকসংখ্যার থেকেও কম, তাছাড়া 'আমেরিকা' নামে নতুন মহাদেশে উর্বর জমি জায়গার সন্ধান পেয়ে কাতারে কাতারে লোক ছুটছে ইয়োরোপ থেকে; সুতরাং জমির অভাবে মানুষ একদিন খাদ্যসংকটে পড়বে একথা তখন মানবে কে?

তারপর যত দিন যেতে লাগলো, মানুষের সংখ্যা যখন হু হু করে বাড়তে লাগলো তখনই হাড়েহাড়ে টের পাওয়া গেলো,—কী অসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিলো ম্যালথাসের। ১৮৩০ সালে ম্যালথাস সাহেব যখন মারা যান, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তখন কমবেশী ১০০ কোটি। সংখ্যাটা দ্বিগুণ হলো ১০০ বছরের মধ্যেই, এবং তা আবার দ্বিগুণ হতে সময় লাগলো ৮০ বছরেরও কম। তেমন অঘটন না ঘটলে পৃথিবীর জন-সংখ্যা আজকের ৪০০ কোটি থেকে ৮০০ কোটিতে পৌঁছতে সময় নেবে বড় জোর তিরিশ বছর। সেদিন সেই বিপুল মানুষের জন্য খাবারের যোগান কোত্থেকে আসবে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ম্যালথাস-কে এখন মনে পড়ছে অনেকেরই।

গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশ খানিকটা বেড়েছে সন্দেহ নেই। আগে যে জমিতে বছরে একবার চাষ হতো, এখন সে জমিতে উন্নতধরনের বীজ লাগিয়ে চাষ হচ্ছে বছরে তিনবার। উন্নতপ্রথায় চাষ করার ফলে, কীট-নাশকের সাহায্যে পোকার হাত থেকে গাছকে বাঁচানোর ফলে শস্যের ফলন বেড়েছে আগের তুলনায় বেশ কয়েকগুণ; সবুজ-বিপ্লব ব্যাপারটাতো আর মিথ্যে নয়। তবুও এশিয়া, আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার কোটি কোটি মানুষ আজও পেট ভরে দু'বেলা খেতে পায় না; আবার যেটুকু খাবার তারা পায় তার মধ্যে প্রোটিনের ভাগ সামান্যই। এরজন্যে মানুষের সমাজের বৈষম্য যেমন বিরাটভাবে দায়ী এবং যাকে দূর করার জন্যে বিশ্বের সর্বত্রই চলেছে আন্দোলনের ঢেউ, তেমনই জন-সংখ্যার বিরাট বৃদ্ধিও নিশ্চিত দায়ী। তা এখনই যদি এ অবস্থা হয় তবে দু'হাজার সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটিতে গিয়ে ঠেকবে—অবস্থাটা কি দাঁড়াবে তখন? পৃথিবীর সমস্ত জমি চষে ফেললেও যে সেদিন অর্ধেক লোকেরও প্রয়োজনীয় খাদ্য মিলবে না!

সেদিনের সেই ভয়াবহ খ্যাদ্যসঙ্কটের হাত থেকে বাঁচার উপায়টা নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে ভাবছেন না, তা নয়। নানাধরনের ব্যাকটেরিয়া, ইষ্ট আর ছত্রাক জাতীয় এককোষী প্রোটিনের সাহায্যে খাদ্যের যোগান বাড়ানো সম্ভব।

ইতিমধ্যেই বেশ কিছু দেশে যান্ত্রিক উপায়ে মিথেন গ্যাস, প্যারাফিন, মিথাইল ও ইথাইল অ্যালকোহল, এবং নানা ধরনের জৈব আবর্জনা যেমন আখের ছিবড়ে, ছেঁড়া-কাগজ, ভুষি বা খড় থেকে এককোষী প্রোটিন তৈরী হচ্ছে, অবশ্য আপাততঃ পশুখাদ্য হিসেবেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এককোষী প্রোটিনকে যেমন মানুষের খাওয়ার উপযোগী করে তোলার চেষ্টা চলছে, তেমনি ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক উপায়ে নতুন নতুন খাবার তৈরীর চেষ্টাও যে চলছে না তা নয়।

যেমন, ইতিমধ্যেই গ্লুকোজ এবং ফরম্যালডিহাইড জাতীয় রাসায়নিক থেকে বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মুশকিল হলো, এর স্বাদ, গন্ধ মোটেই সুবিধের নয়, এবং এসব তৈরি করার খরচও অত্যন্ত বেশী।

মোদ্দা কথা, কৃত্রিম উপায়ে খাবার-দাবার বানানো সম্ভব হলেও আপাততঃ মানুষের ক্ষিধে মেটাতে তা খুব একটা কাজে আসছে না, আর সেজন্যই মানুষের পছন্দসই খাবার-দাবারের উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হচ্ছে। পৃথিবীর ডাঙ্গা জমির দিকে তাকিয়ে লাভ নেই; বস্তুতঃ মরুভূমি ও মেরুঅঞ্চল বাদে সেখানে নতুন করে চাষের জন্য জায়গা আর পড়ে নেই কোথাও। বাকী রইলো সমুদ্র, যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে মাছ আর নানা ধরনের জলজ প্রাণীর যোগান দিয়েছে। তবু মানুষের খাদ্যের মোট চাহিদার তুলনায় তা যৎসামান্যই—শতকরা মাত্র দেড় থেকে দু' ভাগ!

আজ সারা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে জেলেরা প্রতিবছর যে মাছ ধরে তার পরিমাণ কমবেশী সাত কোটি টন; পরিকল্পনা মাফিক এগোলে অনায়াসে মাছের এই পরিমাণটাকে বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া এযাবৎ সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা ছিলো অনেকটা বনজঙ্গলের সাথে শিকারীর যেমন সম্পর্ক হয় তেমন। অথচ, সমুদ্র—ডাঙ্গার চাষের জমির চেয়ে কোনও অংশেই নিরেস নয়। সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলে মাছ এবং জলজ উদ্ভিদ চাষের কথাটা এখন অনেক সমুদ্র বিজ্ঞানীর মাথাতেই ঘুরছে। ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয় এবং সত্যি বললে, পৃথিবী-জোড়া খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলার সেটাই হলো সবচেয়ে সহজ উপায়।

মহাদেশের ডাঙ্গাজমির সঙ্গে সমুদ্রের জলীয় পরিবেশের বিস্তর ফারাক থাকলেও, খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারে দুজায়গাতে একই নিয়ম নীতি কাজ করে। খাদ্য বলতে আমরা যা বুঝি—জলে স্থলে তার মূল উৎস হলো গাছপালা। সালোক সংশ্লেষের সাহায্যে গাছপালা সূর্যের আলো থেকে শক্তি জমা করে নিজেদের শরীরে। উদ্ভিদ খেয়ে প্রাণধারণ করে ছোটখাট জীবজন্তু—যাদের বলা হয় তৃণভোজী। এদের খেয়ে জীবন-ধারণ করে যারা তাদের বলে মাংসাশী, আবার ছোট মাংসাশী জন্তুকে খায় বড় মাংসাশী।

স্যামন মাছ—যা খাদ্য হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয়

গাছপালা থেকে অতিকায় মাংসাশী জন্তু পর্যন্ত এই খাদ্যশৃঙ্খল বা 'ফুড চেইন' আমরা ডাঙ্গাজমিতে দেখি, ঠিক তেমনি খাদ্যশৃঙ্খলের খোঁজ মেলে সাগর-মহাসাগরেও। এক্ষেত্রে জলজ উদ্ভিদ আর 'প্ল্যাংকটন' নামে এক কোষী জীব খেয়ে প্রাণ ধারণ করে যেসব ছোট্ট ছোট্ট মাছ তারাই আবার পেট ভরায় অপেক্ষাকৃত বড়ো মাছ আর অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকুলের, তা সে জলে বা স্থলে যেখানেই বাস করুক, খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গাছপালার উপর নির্ভর না করে তাদের উপায় নেই। সত্যি বলতে কি, গাছের শরীর হলো একটা বিরাট কারখানা যেখানে অহরহ কার্বন-ডাই-অক্সাইড জল আর নানা ধরনের অজৈব রাসায়নিক মিলে মিশে তৈরি হয়ে চলেছে জৈব কণা; কারখানাকে চালু রাখার জন্যে, গাছের ভেতর রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসছে খোদ সূর্য থেকে।

যেহেতু পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা সমুদ্রের দখলে সুতরাং সূর্যের যে আলো বা শক্তি পৃথিবী পায় তার

ম্যাকরেল মাছ—আকারে ছোট হলেও আগামী দিনে জনপ্রিয় খাদ্য হিসেবে এর চাহিদা অনেক বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিংহভাগটাই ভোগ করে সমুদ্র। সৌরশক্তির শতকরা ৭১ ভাগকে ভোগ করলেও সমুদ্রে জৈবকণা সৃষ্টির কাজে আসে তার নগণ্য অংশ। ডাঙ্গাজমির বনজঙ্গলে গাছপালারা যেখানে সূর্যের আলোর শতকরা ৯৯ ভাগকেই সালোক-সংশ্লেষের কাজে লাগায়, সামুদ্রিক গাছপালা আর শ্যাওলারা গড়পড়তা সৌরশক্তির শতকরা ১ ভাগকেও খাদ্য তৈরির কাজে লাগাতে পারে না। অথচ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন বা চর্বি জাতীয় খাদ্য-কণা বানানোর জন্য গাছপালার যা যা প্রয়োজন তার সবই অফুরন্ত রয়েছে সমুদ্রে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল, সূর্যের আলো এমনকি প্রয়োজনীয় খনিজলবণ—সমুদ্রে কোনটারই অভাব নেই। বিজ্ঞানীদের হিসেবে দেখা গেছে—সমুদ্রে রয়েছে কমপক্ষে ২৫,০০০ কোটি টন নাইট্রেট এবং ৭,৫০০ কোটি টন ফসফেট। পৃথিবীর বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রয়েছে তার বিশ-তিরিশগুণ রয়েছে সমুদ্রের জলে—কার্বনেট-এর আকারে।

মুশকিলটা আসলে অন্য জায়গায়। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর জিনিসগুলি সমুদ্রের সবজায়গায় সমান ভাবে ছড়িয়ে নেই। সমুদ্রোপকূলের কাছাকাছি অগভীর জলের ভেতর সূর্যের আলো পেঁছয় প্রায় দেড়শো মিটার পর্যন্ত; এখানেই তাই উদ্ভিদকণাদের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। হেরিং জাতীয় ছোট ছোট মাছ যারা উদ্ভিদকণা খেয়ে বেঁচে থাকে তাদেরও চলাফেরা মূলতঃ উপকূলের কাছে অগভীর সমুদ্রে—যে অঞ্চলকে বলা হয় মহাদেশীয় সোপান।

যতই গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, মাছের ঝাঁক ততই কমে আসে। সাগর-মহাসাগরগুলির শতকরা ৯০ ভাগ অংশেই জীবনের ধারা বড় ক্ষীণ; গভীর জলের নিচে তিমি বা বড়সড় স্কুইড ছাড়া ছোট মাছ তো নজরেই আসে না।

এর ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। গ্রেট ব্রিটেনের পাশে উত্তর সাগরের উপর দিককার জল ঠাণ্ডা হয়ে নিচের দিকে যায়, আর নিচের জল উঠে আসে উপরে। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে

জলের এই ক্রমাগত আনাগোনার ফলে মাছেদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ এবং পুষ্টিকর জিনিসগুলি সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসে উপরে। ফলে উত্তর সাগরের ঐ অঞ্চলগুলি যথেষ্ট গভীর হওয়া সত্ত্বেও ওখানে মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের বিরাট সমারোহ।

সমুদ্রের খাবারের কথা যখন ভাবা হয়, তার মধ্যে সামুদ্রিক উদ্ভিদকেও ধরে নেওয়া হয়। আসলে, সমুদ্রের অধিকাংশ উদ্ভিদই রয়েছে প্ল্যাংকটনের চেহারায়, তারা এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাদের দেখাই যায় না। প্ল্যাংকটনের অস্তিত্ব বোঝা যায় জলের রঙ্ দেখে—কোথাও বা বাদামী-লাল, কোথাও বা নীলচে-সবুজ। অণুবীক্ষণিক চেহারার জন্য ওদের জল থেকে ছেঁকে তোলাও রীতিমত খরচ সাপেক্ষ।

মাঝে মাঝে তো ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্নিয়া কিংবা পেরুর তীরে লাল জলের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে; আসলে 'ডাইনো-ফ্লাজেলেট্' নামে বিশেষ ধরনের প্ল্যাংকটনেরা জলে ভেসে বেড়ায় বলেই জলের রঙ দেখায় লাল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—সমুদ্রের এক লিটার জলে ছ'কোটির উপর প্ল্যাংকটন অনায়াসে থাকতে পারে। সমুদ্রের যেসব জায়গায় 'ডায়াটম' জাতীয় প্ল্যাংকটনেরা ঘুরে বেড়ায় ঋতুবিশেষে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি বর্গমিটারে ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি! অবশ্য এক জায়গায় এত বেশী প্ল্যাংকটন বছরে দু'তিন দিনের বেশী দেখা যায় না।

যেহেতু সমুদ্রের যাবতীয় প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্ল্যাংকটনের কাছ থেকেই প্রোটিনের যোগান পায়, কেউ কেউ হয়তো বা ভাবতে পারে—জল থেকে প্ল্যাংকটনকে ছেঁকে নিয়ে আমাদেরই খেতে তাহলে দোষ কি? বহু নাবিকই সমুদ্রযাত্রায় একবার না একবার এ বস্তুটিকে গলাধঃকরণ করেছেন।

থর হেয়ারডাল, যিনি সেই, 'কর্নটিকি' নামের বিখ্যাত ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁর মতেঃ 'প্ল্যাংকটনের' গন্ধ বড় বিচ্ছিরি। প্রচণ্ড ক্ষিদের সময়ও তাদের কাছে গেলে খাওয়ার ইচ্ছেটা চলে যায়। কিন্তু একবার সাহস করে এক চামচ প্ল্যাংকটন মুখের মধ্যে পুরতে পারলেই ব্যস! প্ল্যাংকটন খেতে এমন কিছু খারাপ নয়।

কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। হিসেব কষে দেখা গেছে, একটা জাহাজ দিন কুড়ি ধরে সমুদ্রে চক্কর দিয়ে যে পরিমাণ প্ল্যাংকটন যোগাড় করতে পারে—তাকে শুকিয়ে আনলে ওজন দাঁড়ায় ২·৭৫ টন; ঐ একই সময়ে অন্য জাহাজে করে প্ল্যাংকটনের বদলে মাছ ধরতে বেরলে কুড়ি দিনে অন্ততঃ দশগুণ বেশী মাছ পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া জলের বাইরে আনলে প্ল্যাংকটনেরা বেশীক্ষণ বাঁচে না, এবং মারা যাওয়ার অল্পসময়ের মধ্যে এদের শরীরে পচন ধরে।

এইসব প্ল্যাংকটনদের খেয়ে যারা বেঁচে থাকে সেই হেরিং বা সার্ডিন জাতীয় মাছ খেতে মানুষ পছন্দ করে, তবে তার চেয়েও পছন্দ করে স্যামন, কড্, টুনা জাতীয় কাঁটা-ওয়ালা
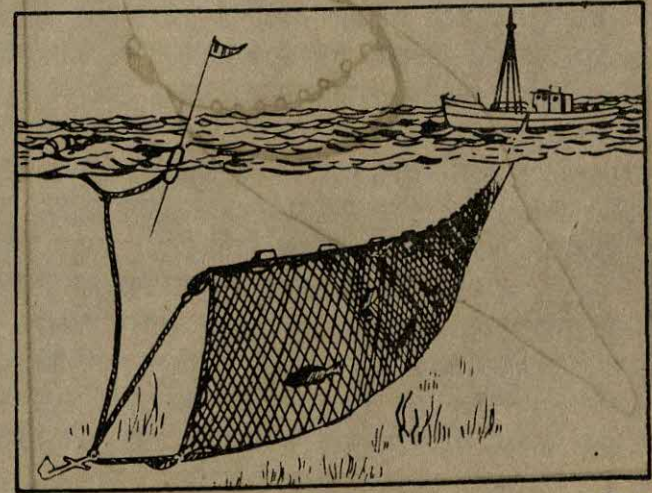
সমুদ্রের বিশেষ অঞ্চলে নোঙর করে মাছ ধরা হয়ে থাকে। গভীর সমুদ্রে অবশ্য এ পদ্ধতি অচল।

বড়ো মাছেদের। এইসব বড় মাছেরা ছোট জাতের মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে বলে ছোটদের তুলনায় বড়োদের সংখ্যা কম। বড়ো মাছেরা আবার তাদের চেয়েও বড়ো হাঙর, স্কুইড আর তিমির
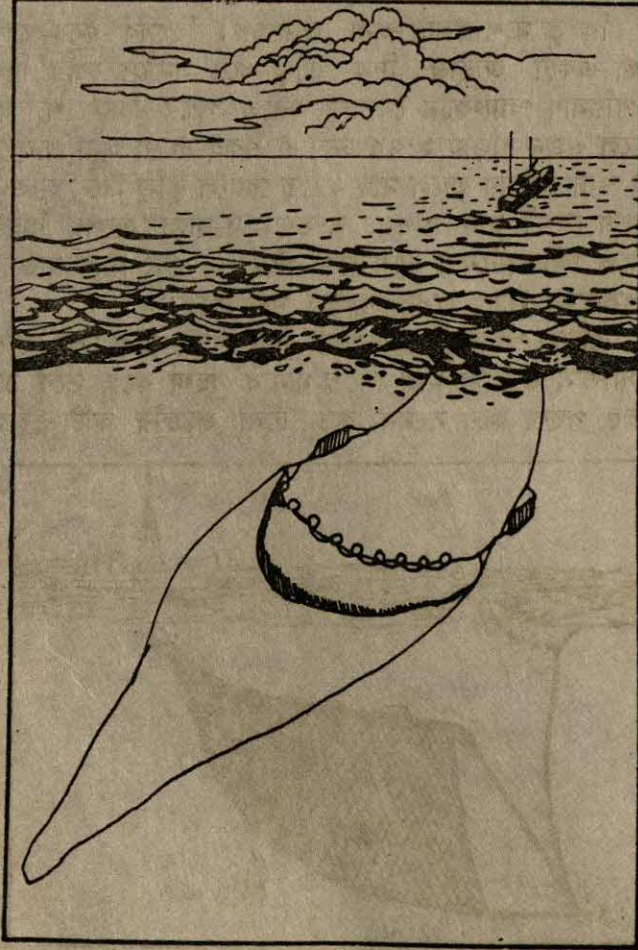
সমুদ্রের নিচুতলায় যেসব মাছ ঘুরে বেড়ায় তাদের ধরে আনার জন্য বিশেষ ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়।

শিকার। স্বাভাবিক ভাবেই স্যামন, কড, ম্যাকরেল-এর তুলনায় হাঙর, তিমির সংখ্যা অনেক অনেক কম।

বিজ্ঞানীরা যে হিসেব কষেছেন, তাতে এখনই প্রতি বছরে যদি ১০ থেকে ১২ কোটি টন ছোট বড়ো মাছ তোলা হয় তবে সমুদ্রের ভাঁড়ারে কোনও টান পড়ে না। আর সেইসঙ্গে—যেসব মাছ খেতে মানুষ এখনও অনভ্যস্ত, সেই স্কুইড, ক্রিল বা লণ্ঠন মাছ খেতে শুরু করে—তবে সমুদ্র আমাদের অনায়াসেই বছরে ৪০ থেকে ৭০ কোটি টন মাছের যোগান দিতে পারে।

আফ্রিকা আর আমেরিকার মাঝে উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরে রয়েছে সারগাসো-সাগর, আগেকার দিনের নাবিকদের কাছে যা ছিলো আতঙ্কের মতো। আতঙ্কের কারণ 'সারগাসোম' নামে এক ধরনের সামুদ্রিক আগাছা—যার নামে ঐ সমুদ্রের নাম।

সারগাসো সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় কখনো সখনো জাহাজকে চারপাশ থেকে আগাছারা ঘিরে ধরে; তখন যেদিকে দৃষ্টি যায়—দেখা যাবে, হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সাগরের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে বাদামী রঙের আগাছাঃ সেই আগাছা ঠেলে এগোয় কার সাধ্যি! আবার অন্য সময় হয়তো সমুদ্রের একই জায়গায় আগাছার কোনও চিহ্নই থাকে না। সারগাসো-সাগর তখন আর পাঁচটা সাগরের মতোই স্বাভাবিক। তরতরিয়ে সে সাগর পাড়ি দিতে কোন বাধাই নেই।

সারগাসো সাগরে কেন এমনটা ঘটে তার উত্তর অবশ্য এখন আমাদের জানা। 'সারগাসোম' নামে আগাছাদের যখন বয়সটা কম তখন তারা থাকে জলের তলায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এদের শরীরে হাওয়া-ভরা ছোট ছোট বেলুনের মতো ব্লাডার গজায়, ফলে এরা ভেসে ওঠে জলের উপর। আগাছাগুলো মরে গেলে ব্লাডারগুলো থেকে বাতাস বেরিয়ে তা চুপসে যায়—ফলে মৃত আগাছাগুলো ডুবে যায় জলের তলায়।

সারগাসোমকে বাদ দিলে অধিকাংশ সামুদ্রিক আগাছাকেই অবশ্য দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্রের তলদেশে। যেহেতু এদের

বেঁচে থাকার জন্য সূর্যের আলোর দরকার; সমুদ্র উপকূলের অগভীর অঞ্চলেই এদের ভীড় বেশী।

ডাঙগার আগাছার মতো এইসব সামুদ্রিক উদ্ভিদও মানুষের নানা কাজে আসে। সমুদ্রের কাছাকাছি বহু দেশেই পশুখাদ্য বা জমির সার হিসেবে সামুদ্রিক আগাছার ব্যবহার চলে আসছে। এতে নাইট্রেট ও পটাশের পরিমাণ প্রচুর; সেই সাথে ভিটামিন ও নানা ধরনের উপকারী মৌল—যা থেকে এনজাইম. হরমোন ইত্যাদি তৈরী হয়, তা থাকার দরুন জমির সার হিসেবে এদের ব্যবহার করলে জমির পুষ্টি যেমন হয়, তেমনি বেশ কয়েকধরনের রোগ থেকেও ফসলকে বাঁচানো যায়।

তবে সামুদ্রিক উদ্ভিদের সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হলো —এগুলি থেকে 'ক্যারাজিনিন' নামে একধরনের আঠালো নির্যাস বের করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিস যেমন, আইসক্রীম, কেক, দাড়ি কামানোর ক্রীম, রঙ, ফলের সিরাপ ইত্যাদিতে এই আঠা ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু ওষুধও বানানো হয় এ থেকে।

খাদ্য হিসেবেও প্ল্যাঙ্কটনের চেয়ে সামুদ্রিক আগাছা অনেক বেশী সরেস। জাপানীরা তো বহু বছর ধরে তাদের খাদ্যতালিকায় সামুদ্রিক আগাছাকে ধরে রেখেছে। জাপানে আজও কমবেশী ৫০ হাজার পরিবারের জীবিকাই হলো, প্রায় দু'লক্ষ একর জলা জায়গায় 'ল্যাভার' নামে এক বিশেষ জাতের সামুদ্রিক শ্যাওলার চাষ। জাপানী ভাষায় একে বলা হয় 'নোরী'। কৃত্রিম উপায়ে সামুদ্রিক শ্যাওলার চাষ ওখানে চলে আসছে প্রায় ৩০০ বছর ধরে।

সামুদ্রিক আগাছা একসময় ব্রিটেনেও রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এডিনবরার রাস্তায় ফিরিওয়ালারা একজাতের মিষ্টি সামুদ্রিক-গুল্ম বিক্রি করতো। প্রায় শ'খানেক বছর হলো, ইংরেজরা তাদের খাবার টেবিল থেকে সামুদ্রিক উদ্ভিদদের পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে ইয়োরোপের আরো কয়েকটি দেশে।

এখন শিল্প-কাজে ব্যবহারের জন্য ব্রিটেনের সাউথ ওয়েলস্-এর উপকূল থেকে বছরে ২০০ টনের মতো ল্যাভার জাতীয় আগাছা তোলা হয়; অথচ, শুধু খাদ্য হিসেবেই জাপানে এর চাহিদা বছরে এক লক্ষ টনের মতো!

ইয়োরোপের নরওয়ে এবং স্কটল্যাণ্ডে অবশ্য এখনও সামুদ্রিক আগাছার কিছুটা চাহিদা আছে। ওখানে এগুলিকে সেদ্দ করে গরু-ঘোড়াকে খেতে দেওয়া হয়। নরওয়ে, ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড—এসব দেশে কারখানায় সামুদ্রিক গুল্ম-আগাছা থেকে পশুখাদ্য, সার ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

অথচ এইসব সামুদ্রিক আগাছায় প্রোটিনের ভাগ যথেষ্টই—যদিও অভ্যেস না থাকলে প্রথম প্রথম হজমের গণ্ডগোল বাধায় এরা। গমের তুলনায় এদের মধ্যে আয়োডিন থাকে ৩০০ গুণ বেশী, এবং লোহা থাকে ৫০ গুণ বেশী। তাছাড়া এদের মধ্যে পটাশিয়াম ও অন্যান্য উপকারী মৌলের পরিমাণটাও অপেক্ষাকৃত বেশী।

আগামী দিনে মানুষের খাদ্যের ঠিক পরিপূরক না হলেও সামুদ্রিক আগাছার ব্যবহার অবশ্যই এখনকার তুলনায় অনেক বাড়ানো যায়। সমুদ্রে এদের অভাবও নেই। শুধু সারগাসো-সমুদ্রেই সময়ে সময়ে ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টন 'সারগাসোম'-আগাছা ভেসে বেড়ায়। জাপানীদের মতো অন্যান্য দেশের মানুষেরাও যদি সামুদ্রিক আগাছা-গুল্ম-শ্যাওলাকে তাদের খাবার পাতে টেনে আনতে পারে তবে খাদ্যসমস্যার আংশিক সমাধান যে হয় তাতে সন্দেহ নেই।

কয়েক হাজার বছর আগে ডাঙগার মানুষ বুঝেছিলো—বনজঙ্গল থেকে ফলমূল যোগাড় করে কিংবা বন্যজন্তু শিকার করে পেট ভরানোর বদলে চাষবাস বা পশুপালন করাটা আখেরে লাভ দেয়; তাতে খাদ্যের যোগানে কোনও ঘাটতি পড়ে না। কথাটা যে শুধু ডাঙগাজমি নয়, সমুদ্রের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য সেটা বোঝারও সময় এসেছে।

চৌদ্দ

সত্যযুগে দেবতা আর অসুররা ঠিক করলেন—অমৃত পান করে তাঁরা অজর, অমর ও নিরাময় হবেন। অমৃত লাভের আশায় তাঁরা মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকীকে দড়ি হিসেবে ব্যবহার করে 'ক্ষীরোদ' সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করলেন। হাজার বছর ধরে মন্থনের পর বিষ উঠলো সাগর থেকে, আর সে বিষ পান করে মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ। এরপর দেবাসুররা আবার সমুদ্র মন্থন শুরু করলে মন্দার পর্বত গিয়ে পাতালে লুকোলেন। তখন দেবতা ও গন্ধর্বদের প্রার্থনায় বিষ্ণু কচ্ছপের রূপ ধরে, মন্দার পর্বতকে নিজের পিঠের উপর চাপিয়ে নিলেন। এরপর আরও হাজার বছর মন্থনের পর সমুদ্র থেকে একে একে আবির্ভূত হলেন—সর্বরোগ-বিশারদ ধন্বন্তরি, অপ্সরার দল, বরুণের কন্যা বারুণী বা সুরা। সাগর মন্থনের ফলে পাওয়া গেলো উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভ মণি আর সবশেষে মিললো—অমৃত। সেই অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবাসুরের মধ্যে তখন শুরু হলো তুলকালাম কাণ্ড।......

বাল্মীকি মুনির যে দূরদৃষ্টি ছিলো তা না মেনে উপায় নেই। সাগরজলের বাসিন্দাদের শরীর থেকে তীব্র বিষ আর জীবনদায়ী ওষুধ—দুই-ই মিলছে এখন। সবচেয়ে বড়ো কথা—সমুদ্র যে অপার ঐশ্বর্যশালিনী এবং উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ মণি, অপ্সরা, অমৃত—এসব যে সেই ঐশ্বর্যেরই প্রতীক—বাল্মীকির সেই কল্পনার বাস্তব রূপটা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

জানা গেছে—মহাদেশগুলোর মাটির তলায় যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী সম্পদ মজুত রয়েছে সাগর-মহাসাগরে। হালফিলের আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও তার সামান্য অংশই তুলে আনতে পারছি আমরা। অবশ্যই খনিজ সম্পদের কথাই বলছি।

১৯৬৭ সালে রাষ্টপুঞ্জে দাখিল করা এক হিসেব থেকে জানতে পেরেছি, অন্যান্য বহু সম্পদের সঙ্গে পৃথিবীর সমুদ্রগুলিতে আছে ৪·৩ হাজার কোটি টন অ্যালুমিনিয়াম, ৩৬ হাজার কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ, ৮০০ কোটি টন তামা, ১৫০০ কোটি টন নিকেল, ৫২০ কোটি টন কোবাল্ট, ১০০ কোটি টন মলিবডেনাম এবং ৫০ লক্ষ টন সোনা।

এরমধ্যে আবার শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরেই আছে ২১ হাজার কোটি টন লোহা, ১ হাজার কোটি টন টাইটানিয়াম, ২·৫ হাজার কোটি টন ম্যাগনেসিয়াম, ১৩০ কোটি টন সীসা আর ৮০ কোটি টন ভ্যানাডিয়াম। হাল আমলে, আরও নতুন নতুন খনিজের সন্ধান মিলেছে অঢেল পরিমাণে। সেদিক থেকে, সমুদ্রকে যে 'রত্নাকর' বলা হয়—সেটা নেহাৎ মিথ্যে নয়!

সাগরের খনিজ সম্পদকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটায় রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ব্রোমিন, আয়োডিন থেকে শুরু করে সোনা-রুপো ইত্যাদি প্রায় ৭০টির বেশী মৌল—এযাবৎ যাদের সন্ধান মিলেছে সাগরের জলে মিশে থাকা নুনগুলোর মধ্যে। এইসব মৌলগুলোকে সাগরজল থেকে আলাদা করার কায়দা রপ্ত করতে মানুষের হাজার-হাজার বছর লাগলেও, নানাজাতের সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং প্রাণী বহুকাল থেকেই রসায়নবিদের মতো পছন্দসই মৌলগুলিকে সাগরজল থেকে ছেঁকে নিয়ে নিজেদের প্রয়োজনে লাগিয়ে চলেছে।

উদাহরণ হিসেবে 'হলোথুরিয়ান' নামে এক ধরনের আলসে প্রকৃতির সামুদ্রিক প্রাণীটির কথাই ধরা যাক্। এদের রক্তে 'ভ্যানাডিয়াম' নামে এক মৌল ধাতুর সন্ধান মিলেছে সম্প্রতি। অথচ সাগরজলে যে ঐ বিশেষ ধাতুটির অস্তিত্ব থাকতে পারে, বিজ্ঞানীমহল তা ভাবতেও পারেননি এর আগে।

সমুদ্রের খনিজসম্পদের দ্বিতীয় ভাগটা নুড়ির আকারে ছড়িয়ে রয়েছে জলের নিচে সাগরতলে। বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় —এগুলি হলো 'ম্যাঙ্গানীজ-নুড়ি' যার মধ্যে থাকে ম্যাঙ্গানীজ, লোহা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু। এইসব নুড়ি আয়তনে সরষে দানা থেকে শুরু করে বড়সড় আলুর মতোও হতে পারে।

এছাড়াও আর এক ধরনের সম্পদ লুকিয়ে আছে সাগরের নিচে মাটির তলায়। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় জ্বালানী তেলের। আজকের জ্বালানী সংকটের দিনে, মানুষের কাছে পেট্রোলিয়ামের উৎস হিসেবে সাগর-উপসাগরের ভারি কদর! এছাড়া কানাডা, ব্রিটেন, জাপান, চিলি, তাইওয়ান—এসব দেশের উপকূলের কাছাকাছি অগভীর সমুদ্রের তলায় নিয়মিত মাটি খুঁড়ে কয়লা এবং লোহার আকরিক তুলে আনা হচ্ছে বেশ কিছুকাল ধরে।

সাগরের মাঝে লুকিয়ে থাকা তিন ধরনের সম্পদের দিকে এক এক করে চোখ ফেরানো যাক; আর যেহেতু যাবতীয় ধাতুর মধ্যে সোনার কদর সবচেয়ে বেশী, সাগর-সম্পদের জরীপ শুরু করা যাক ঐ সোনাকে দিয়েই।

●

১৮৬১ সালের আগে অবধি সাগরজলে সোনার অস্তিত্বের কথা কেউ চিন্তা করেননি। ঐ বছরই ফরাসী বিজ্ঞান আকাডেমীর এক অধিবেশনে সাগর থেকে সোনা পাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাটা প্রথম উচ্চারণ করেন অ্যাডল্ফ্ ওয়্যারজ্। এর ২৬ বছর পরে 'সন্‌স্ট্যাট্' নামে জনৈক ইংরেজ বিজ্ঞানী লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় জানালেন, ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের কাছে প্রতি এক মেট্রিক টন সাগরজলে ৬৫ মিলিগ্রাম করে সোনা আছে। এর বহু বছর পর ১৯৩০ সাল নাগাদ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতাইচি ইয়াসুডা জাপানের উপ-কূলবর্তী চীন সাগরের জলে কিছু সোনার খোঁজ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—ওখানে প্রতি ১০ টন সমুদ্রজলে ২৫ সেন্ট দামের সোনা রয়েছে এবং তা একদিন লাভজনকভাবে নিষ্কাশন করা চলবে। জাপানী বিজ্ঞানীরা নাকি সেইসময় সামান্য পরিমাণে সোনা সমুদ্র থেকে নিষ্কাশিতও করতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে গত কয়েক দশকে, বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সাগরজল থেকে সোনা উদ্ধারের সহজ উপায় বের করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। উপায় যে বেরোয়নি তাও নয়; মুশকিল হলো, সমুদ্র থেকে যে উপায়েই সোনা তুলে আনা হোক না কেন, সোনার দামে সে খরচ পোষাচ্ছে না।

জনৈক বিজ্ঞানী একবার তো অঙ্ক কষে দেখালেন, সাগর-জল থেকে ১ পেনি দামের সোনা নিষ্কাশন করতে কোনও

কোনও জায়গায় ৪,০০০ স্টার্লিং-এর বেশী খরচ পড়ে। এ তো যেন 'ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি'! সমুদ্র থেকে সোনা, রূপো বা প্ল্যাটিনাম আহরণের ক্ষেত্রে এটাই আপাততঃ শেষ কথা।

সব মিলিয়ে পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরে রয়েছে ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার নোনা জল। সাগরের জল থেকে যদি যাবতীয় ধাতু এবং ধাতু-ঘটিত নুনগুলিকে আলাদা করা যায়, তবে প্রতি ঘন কিলোমিটার সমুদ্রজলের খনিজ-ঐশ্বর্যের দাম হয় অন্ততঃপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা! আসল কথা, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার নুন, ম্যাগনেসিয়াম ধাতু এবং ম্যাগনেসিয়ামের নানা যৌগ আর ব্রোমিন, এই কটিকে বাদ দিলে, সমুদ্রজল থেকে বাকী যাবতীয় ধাতু বা রাসায়নিক যৌগগুলিকে উদ্ধার করা মোটেই লাভজনক নয়।

আপাততঃ যদ্দিন না সাগর জল থেকে সহজে এবং কম খরচায় ধাতুগুলো নিষ্কাশন করার কায়দা বেরোচ্ছে, তদ্দিন খাবার নুন, ম্যাগনেসিয়াম আর ব্রোমিন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাদের। তবে হ্যাঁ—এগুলোর পরিমাণও একেবারে হেলাফেলার নয়।

১৯৭০ সালের হিসেবেই দেখা যাচ্ছে, সারা পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর থেকে বছরে ৩৩৫ কোটি টাকার ধাতব নুন ঘরে তোলা হয়। এর অর্ধেকই অবশ্য খাবার-নুনের দাম হিসাবে ধরতে হবে। পৃথিবীর মানুষের মাথাপিছু গড়ে বছরে ৮ কিলোগ্রাম খাবার-নুনের প্রয়োজন; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাগরজলকে শুকিয়ে নিয়ে যে নুন পাওয়া যায় তা এখন মানুষের মোট চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ মেটায়।

একহাজার ঘন মিটার সাগর জলে গড়ে ১·৩ টন নুন পাওয়া সম্ভব, এবং সেই হিসেবে, পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরে মোট যে পরিমাণ নুন মজুত আছে তাতে আগামী ১৭০০ কোটি বছরেও মানুষের খাবার পাতে নুনের টান পড়বে, এমন আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।

এবার আসি ম্যাগনেসিয়ামের কথায়। এ শতাব্দীর গোড়ায়, ম্যাগনেসিয়াম বলতেই মনে পড়তো, অল্প আলোয় ফটো তোলার জন্য 'ম্যাগনেসিয়াম ফ্ল্যাশে'র কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 'জেপেলিন' নামে বিখ্যাত সেই উড়োজাহাজ তৈরির সময় হাল্কা ধাতু ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহৃত হলো। সেই সময়ে ম্যাগনেসিয়ামের প্রধান খনিগুলো ছিলো জার্মানীর দখলে। ফলে অন্য দেশগুলোকে বাধ্য হয়েই ম্যাগনেসিয়ামের খোঁজে সমুদ্রের দিকে নজর দিতে হলো। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন-ই প্রথম সাগরজল থেকে ম্যাগনেসিয়াম নিষ্কাশন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উন্নত ধরনের বিমান তৈরির জন্য ম্যাগনেসিয়ামের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অ্যারোপ্লেনের কাঠামো তৈরি হয় যে সঙ্কর ধাতু দিয়ে তাতে অ্যালুমিনিয়ামের বদলে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার করলে, ওজন কমে যায় শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ। ম্যাগনেসিয়ামের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে এখন আরও বেশী করে হাত বাড়াতে হচ্ছে সমুদ্রের দিকে। এক ঘনমিটার সাগরজল থেকে গড়ে ১ কিলোগ্রামেরও বেশী ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া সম্ভব। আপাততঃ পৃথিবীতে ম্যাগনেসিয়ামের মোট চাহিদার অর্ধেক মেটাচ্ছে সমুদ্র।

ম্যাগনেসিয়ামের মতো পটাসিয়ামের খনিগুলোও প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর দখলে থাকার ফলে ব্রিটিশরা ডেড-সী থেকে এবং ইটালী, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশগুলো তাদের সাগর-উপসাগরের উপকূল অঞ্চলের পলি থেকে পটাসিয়াম যোগাড় করার কাজে নেমে পড়ে। সাগরজলের প্রতি ঘনমিটারে ৪০০ গ্রাম পটাসিয়াম থাকা সত্ত্বেও, সাগর থেকে ম্যাগনেসিয়ামের তুলনায় পটাসিয়াম আহরণের পরিমাণ এখনও তেমন বড় কিছু নয়।

সাগরজলের অন্যতম প্রধান সম্পদ হিসেবে ব্রোমিন-এর কথা বলতেই হয়। বস্তুতঃ আজকের দুনিয়ায় ব্রোমিনের যে চাহিদা—তার অর্ধেকের বেশী মেটাচ্ছে সমুদ্র। সরাসরি সমুদ্র থেকে ব্রোমিন নিষ্কাশন শুরু হওয়ার আগে, পৃথিবীর লবণ-

হ্রদ জাতীয় জায়গা, যেখানে এককালে সমুদ্রের জল বয়ে যেতো, সেই সব অঞ্চল থেকে এই ধাতুটি যোগাড় করা হতো।

জ্বালানী তেলের বিস্ফোরণ ক্ষমতা বাড়ানোয় ব্রোমিনের ব্যবহার শুরু হতেই এর চাহিদা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। ফলে সাগরজল থেকে 'ব্রোমিন' নিষ্কাশনের জন্য সাগরতীরে গড়ে উঠছে একের পর এক কারখানা।

•

এবারে যাওয়া যাক জলের চার-পাঁচ হাজার মিটার গভীরে সমুদ্রের তলদেশে--যেখানে ছড়িয়ে আছে অগুন্তি ম্যাঙ্গানীজ নুড়ি। এই নুড়িগুলির মধ্যে থাকে প্রধানতঃ ম্যাঙ্গানীজ আর লোহা—যার প্রত্যেকটার পরিমাণ নুড়ির মোট পরিমাণের প্রায় ১৫ শতাংশ। এছাড়াও ঐ নুড়িগুলি থেকে সামান্য পরিমাণে নিকেল, তামা, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, দস্তা ইত্যাদিও মেলে। সব সাগর-মহাসাগরের তলায় এদের পাওয়া যায়,—কোথাও কম কোথাও বা বেশী। ১৯৮১ সালে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা 'গবেষণী' জাহাজে চেপে ভারত মহাসাগরের সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার গভীরে তল্লাসি চালিয়ে যেসব ম্যাঙ্গানীজ নুড়ি কুড়িয়ে এনেছেন তাতে ম্যাঙ্গানীজ রয়েছে গড়ে ১৫·৫৭ শতাংশ। সবচেয়ে বেশী, ৩৭ শতাংশ ম্যাঙ্গানীজও পাওয়া গেছে কোনও কোনও নুড়িতে। লোহার পরিমাণ ৩৭ শতাংশ, নিকেল ১·৫৫ শতাংশ, তামা ১·৩৬ এবং কোবাল্ট ০·৯৯ শতাংশ।

ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির আকার যেমন হরেক রকমের—কোনটা চ্যাপ্টা, কোনটা গোল, কোনটা বা ছুঁচলো—তেমনি রঙের বাহারও এদের কম নয়। সাধারণতঃ কালচে নুড়িতে ম্যাঙ্গানীজের ভাগ থাকে বেশী, আর লোহা বেশী থাকে তামাটে নুড়িগুলিতে। ভারত মহাসাগরের তলায় পাওয়া নুড়িগুলির গড় ব্যাস ৮·৩ সেন্টিমিটার; ওজন ৩০০ গ্রামের মতো। ভারত মহাসাগরের যেসব অঞ্চলে সমীক্ষা চালানো হয়েছে—দেখা গেছে, সেখানে প্রতি বর্গ মিটার ভূস্তরে ছড়িয়ে রয়েছে গড়ে প্রায় কিলোগ্রাম নুড়ি।

১৮৭২ সালে একদল বিজ্ঞানী আর হরেকরকম যন্ত্রপা নিয়ে ইংল্যাণ্ডের উপকূল থেকে মহাসাগর পরিক্রমায় বেরো
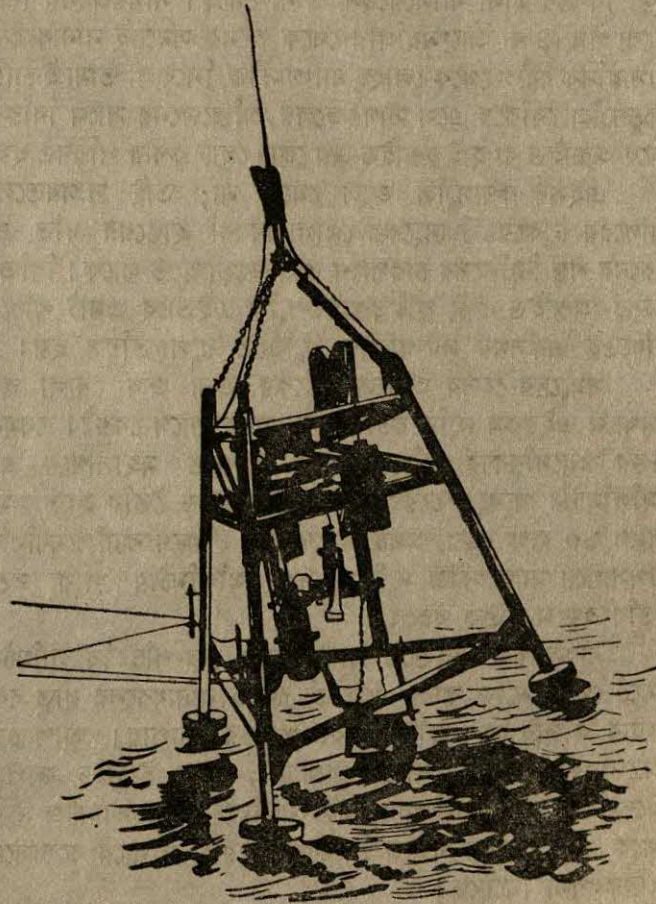
তেপায়া ফ্রেম-এর গায়ে টেলিভিসন ক্যামেরা সাগরতলে নামিয়ে দেওয়া হয়- ম্যাঙ্গানিজ নুড়ির খোঁজে।

'চ্যালেঞ্জার' জাহাজ। সমুদ্রকে জানবার জন্য বিজ্ঞানীদের সেটাই প্রথম বড়োসড়ো প্রয়াস। চ্যালেঞ্জারের সেই যাত্রাতেই প্রথম ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির সন্ধান মেলে। তারপর থেকেই বিজ্ঞানীরা সাগরতলে এজাতীয় নুড়ির জন্মবৃত্তান্ত বের করার জন্য বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন, জানা গেছে। সাগরজলের নিচে ডুবো পাহাড় বা আগ্নেয়গিরি থেকে অনেক সময়েই নানাধরনের রাসায়নিক যৌগ থেকে লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল, তামা ইত্যাদি ধাতুগুলি বেরিয়ে এসে সাগরজলের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড-এর ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়।

এইসব কণাগুলি জলে মেশে না; তাই সাগরতলের পাথরের টুকরো, ঝিনুকের খোলা কিংবা হাঙরের দাঁত, এই ধরনের শক্ত জিনিসের চারপাশে এরা জড়ো হতে থাকে। বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইডগুলি এইভাবে জমাট বাঁধতে বাঁধতেই একসময় ম্যাঙ্গানীজ নুড়িতে রূপান্তরিত হয়।

সমুদ্রের যেসব অঞ্চলে পাঁকের জন্য জল ঘোলা হয়, সেখানে এইরকম নুড়ি তৈরি হতে সময় লাগে বেশী। যেমন, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে—এক মিলিমিটার পুরু স্তরের ম্যাঙ্গানীজ নুড়ি তৈরি হতে সময় লাগে ১০ লক্ষ বছর, অথচ ঐ দেশটার দক্ষিণে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির এক মিলিমিটার পুরু স্তর তৈরি হয় মাত্র এক বছরে!

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সাগরজলের চার-পাঁচ কিলোমিটার নিচে থেকে নুড়ি তুলে এনে তা থেকে নানাধরনের ধাতু বের করার কাজটা বেশ জটিল এবং খরচের ব্যাপার। আপাততঃ আমেরিকা, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলন্ড, জাপান, অস্ট্রেলিয়া আর বেলজিয়াম, এই আটটা দেশই ম্যাঙ্গানীজ নুড়ি থেকে নানা ধরনের খনিজ নিষ্কাশন করার ব্যাপারে বড়োসড়ো পরিকল্পনা নিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে—পৃথিবীর মহাদেশগুলির মাটির তলায় যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ বা লোহা মজুত থাকা সত্ত্বেও অত খরচ করে ম্যাঙ্গানীজ নুড়ির খোঁজে সমুদ্রের তলায় ছোটার দরকারটা কি? দরকারটা আসলে নিকেল, তামা, কোবাল্ট, এইসব ধাতুগুলোর জন্য। পৃথিবীর ডাঙ্গাজমির তলায় এই সব ধাতুর সঞ্চয় ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে, অথচ নানা-ধরনের শিল্পে এদের চাহিদা দিনদিন বেড়েই চলেছে। আগামী দিনে এইসব মূল্যবান ধাতুগুলির আকাল থেকে একমাত্র ম্যাঙ্গানীজ নুড়িই আমাদের বাঁচাতে পারে।

বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী—শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে যে নুড়ি রয়েছে তাতে নিকেলের পরিমাণ ৩৫৮০০ কোটি টন। বছরে ৩০ লক্ষ টন ধাতুর উৎপাদন করতে পারে এমন প্রায় একশোটা জায়গার খোঁজ মিলেছে সাগর-মহাসাগরে। ঐসব জায়গাগুলি থেকে নুড়ি তুলে আনা এবং তা থেকে ধাতুগুলিকে বের করার কাজ সম্ভবতঃ শুরু হবে এ শতাব্দীর শেষে।

●

গত শতাব্দীর শেষে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে সাগরের নিচে মাটির তলায় জ্বালানী তেলের প্রথম খোঁজ মিললেও—সেই তেল তুলে আনার ব্যাপারে প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হতে হতে ৫০ বছর কেটে গেছিলো।

১৯৪৬ সালের পর থেকে আজ অবধি সমুদ্রের অগভীর উপকূলে মহাদেশীয় সোপানগুলোর নিচে বিশ হাজারেরও বেশী কূপ খোঁড়া হয়েছে। এখন পৃথিবীতে জ্বালানী তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের যা চাহিদা তার প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ আসছে সমুদ্রের নিচের ঐ কূপগুলো থেকে। ভূ-বিজ্ঞানীদের হিসেবে—গোটা পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের যে মজুত ভান্ডার রয়েছে তার অন্ততঃ চারভাগের একভাগ রয়েছে উপকূলের কাছাকাছি সাগরের তলায় এবং তার পরিমাণ কম-বেশী প্রায় ১৫০০ কোটি টন।

পেট্রোলিয়ামের জন্য কূপ খোঁড়া বলতে ভূস্তরের গভীরে নল বসানোর ব্যাপারটাকেই বোঝায়। আমাদের দেশের পশ্চিম উপকূল থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে আরবসাগরের 'বম্বে হাই' অঞ্চলে তেল খোঁজার কাজ শুরু হয় ১৯৭৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী। এই কাজের জন্য বিশেষ ধরনের জাহাজ 'সাগর সম্রাট'কে অর্ডার দিয়ে জাপান থেকে তৈরি করে আনা হয়। কাজ শুরুর সপ্তাহ তিনেক পর বম্বে হাই-তে তেলের সন্ধান মিললো—সাগরতলের ১১৬০ মিটার নিচে।

১৯৮১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত 'তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন'-এর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা ভারতের পশ্চিম এবং দক্ষিণ উপকূলে পরীক্ষামূলকভাবে যে ৯১টি কূপ খুঁড়েছেন তার ৫৬টির মধ্যে তেল বা গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বম্বে হাই ছাড়াও তেল মিলেছে বঙ্গোপসাগরে —নর্মদা এবং গোদাবরীর মোহানায়; প্রাকৃতিক গ্যাস মিলেছে আন্দামানের উপকূলে, পণ্ডিচেরীর কাছে 'পোর্তো নোভো' অঞ্চলে।

আপাততঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল তোলা হচ্ছে ক্যাম্বে উপসাগর, উত্তর এবং দক্ষিণ বম্বে হাই অঞ্চল থেকে। সাম্প্রতিক হিসেব বলছে, আমাদের দেশে এখন তেলের যে চাহিদা তার প্রায় ৪০ শতাংশ মিলছে বিভিন্ন সাগর থেকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর-উপসাগরের মাটির তলা থেকে পেট্রোলিয়াম ছাড়াও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অন্যান্য যে খনিজ তোলা হয়, তার ৯০ শতাংশই হলো কয়লা; বাকী ১০ শতাংশের অর্ধেক হলো লোহা এবং আর অর্ধেক—সালফার।

সমুদ্র গর্ভ থেকে প্রথম কয়লা তুলে আনার ব্যাপারে কৃতি দাবী করতে পারে স্কটল্যাণ্ডের উপকূলবাসীরা।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দেই ওরা সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গ কে মহাসাগরের মাটির নিচে সঞ্চিত কয়লা তুলে আনা শুরু করে সারা পৃথিবীতে এজাতীয় কয়লাখনির সংখ্যা এখন একশো' বেশী। সমুদ্রগর্ভের কয়লা তুলে আনার ব্যাপারে এখন সবচে এগিয়ে রয়েছে জাপানীরা; এখন ওরা সাগরতলের ২৫০ মিটার নিচে থেকে তুলে আনছে প্রয়োজনীয় কয়লার ৩ শতাংশ।

সমুদ্রগর্ভ বা সাগরজল ছাড়াও সমুদ্রোপকূলে বালিতেও নানা ধরনের খনিজের সন্ধান মিলেছে। এর মধে বিশেষ করে মোনাজাইট-এর নাম করতে হয়। আমাদের দেশে পশ্চিম-উপকূলে বিশেষ করে কেরালার সাগরতীরে বালিয়াড়িতে অন্ততঃপক্ষে ৫০ লক্ষ টন মোনাজাইট আছে বলে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই মোনাজাইটের মধে রয়েছে প্রায় ৮ শতাংশ থোরিয়াম অক্সাইড। এটাই পৃথিবীতে থোরিয়ামের সবচেয়ে বড়ো মজুত ভাণ্ডার। এই থোরিয়াম থেকেই মেলে ইউরেনিয়াম-২৩৩, পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানী হিসেবে যার একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি সিমেন্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রবাল ও শামুকের খোলা-সমৃদ্ধ বিপুল পরিমাণ চুনাপাথরের খোঁজ মিলেছে আন্দামান সাগর মান্নার উপসাগর ও পক্ প্রণালীর অগভীর জলের নিচে।

বলা বাহুল্য—পৃথিবীর ডাঙ্গাজমির নিচে খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে আসার দিনে, রত্নাকর সমুদ্রই আজ মানুষের সবচেয়ে বড়ো ভরসা।
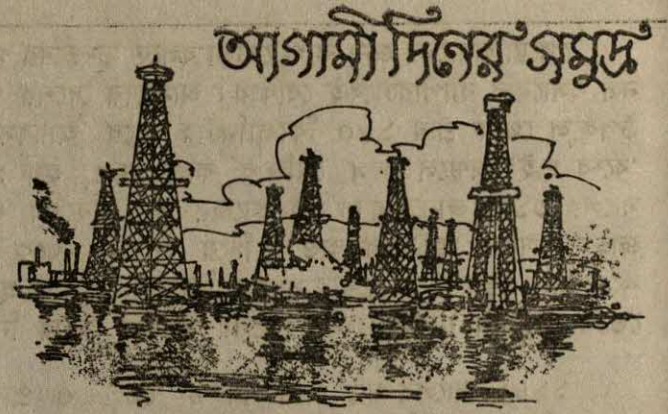
যে হারে আজ পৃথিবীতে প্রতিদিন লোক বাড়ছে, যে হারে গাড়ী আর কলকারখানার বিষ পৃথিবীর জল-বাতাসকে দূষিত করছে, যে হারে জ্বালানী তেল আর অন্যান্য খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে আসছে, যে হারে বন কেটে বসত গড়ছে মানুষ —তাতে এ গ্রহ থেকে মানুষের পাততাড়ি গোটানোর সময় যে আর বাকী নেই এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেই অবস্থা থেকে বাঁচতে—সমুদ্রই এখন আমাদের কাছে শেষ ভরসা। এই কথাটা অবশ্য আমরা বুঝেছি একেবারে হাল আমলে।

কয়েক দশক আগেও প্রধানতঃ দুটো কারণে সমুদ্রের কিছু গুরুত্ব ছিলো মানুষের কাছে। প্রথমতঃ সমুদ্র থেকে মাছ আর খাবার-নুনের খানিকটা যোগান আসে; দ্বিতীয়তঃ জাহাজে করে সাগর-পাড়ি না দিলে নতুন নতুন দেশে পেঁছোনো যায় না। সমুদ্রের অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার আর খনিজসম্পদের খোঁজ মেলার পর—দেশবিদেশের বিজ্ঞানীরা এখন এগিয়ে আসছেন নতুন নতুন সব পরিকল্পনা নিয়ে। এই-সব পরিকল্পনা আসলে আগামী দিনের মানুষের জন্য, যাদের বেঁচে থাকার মূল রসদটা সেদিন যোগাবে ডাঙ্গাজমির বদলে সাগর-মহাসাগর।

আজ এই মুহূর্তে পৃথিবীর বেশ কিছু মানুষকে ঘর-সংসার করতে হয় সমুদ্রের উপর। সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যায়, কিংবা জাহাজে চড়ে সারা পৃথিবী যারা টক্কর দেয়, তাদের কথা বলছি না। আসলে, উপকূল অঞ্চলে অগভীর সমুদ্রের নিচে জমে থাকা জ্বালানী তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস বের করে আনার হার গত দুদশকে অনেকটা বেড়েছে এবং এখন সারা পৃথিবীতে যেসব তেলকূপগুলো থেকে তেল উঠছে তাদের প্রায় চারভাগের একভাগই রয়েছে সাগর-উপসাগরের নিচে। সেইসব কূপগুলি থেকে তেল তুলে আনার জন্য মানুষকে সমুদ্রের বুকে মাচা বেঁধে তার উপর পাম্প বসাতে হয়েছে, তেল পরিশোধনের আংশিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছে, কর্মীদের থাকার জন্য ঘরদোর বানাতে হয়েছে।

যেমন, আমাদের দেশেই বম্বে থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে আরব-সাগরের ‘বম্বে-হাই’ নামে যে অঞ্চল থেকে এখন পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস তোলা হচ্ছে, সেখানে গেলে দেখা যাবে—আটটা পায়ার উপর বসানো আছে বিশাল এক প্ল্যাটফর্ম; ঐ পায়াগুলো ছাড়াও আরো ১৬টা স্তম্ভ শক্ত করে ধরে রেখেছে প্ল্যাটফর্মটাকে। ওদের কোনো কোনোটা সমুদ্রের নিচের ভূস্তরের প্রায় ১০০ মিটার গভীরে নেমে গেছে। প্ল্যাটফর্মের উপর পরপর তিনটে ডেক—একতলা,

দুতলা, তিনতলা। একদম উপরের ডেকটার নাম হেলিডেক—হেলিকপটার নামে ওখানে। নিচের ডেকগুলোয় ছড়িয়ে রয়েছে সমুদ্রগর্ভ থেকে তোলা তেল আর গ্যাসের নল, জেনারেটর, আর প্রায় শখানেক কর্মীর খাওয়া-শোওয়া, বসার জন্য সারি সারি কেবিন, লাইব্রেরী, তাস-ক্যারাম খেলার ঘর, লাউঞ্জ—কী নেই ওখানে! ঠিক যেন সমুদ্রের বুকে মাচার উপর একটা ক্ষুদে জনবসতি।

জনসংখ্যার চাপ বাড়ার সাথে সাথে সমুদ্রের বুকে সত্যিকারের জনবসতি গড়ে তোলার পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আগামী তিন-চার দশকের মধ্যেই হয়তো পৃথিবীর কর্কট এবং মকর ক্রান্তি রেখার মধ্যে তিন মহাসাগরেরই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে উঠবে অসংখ্য ভাসমান শহর। সাত থেকে বারো বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এক একটা প্রকান্ড ভেলার উপর তৈরি হবে এক একটা শহর।

শহরগুলোয় থাকবে বড়ো বড়ো কারখানা আর তাদের ঘিরে ঘর-বাড়ী-স্কুল-কলেজ-রাস্তাঘাট-দোকানপাট—ঠিক যেন আজকের এক ছোট ইস্পাত নগরী। কারখানাগুলোর কাঁচা মাল আসবে সমুদ্র থেকে। কাঁচা মাল বলতে প্রধানতঃ মাছ, ঝিনুক আর অন্যান্য ভোজ্য প্রাণী এবং ম্যাঙ্গানীজ নুড়ি। মাছ আর অন্যান্য প্রাণী থেকে ভোজ্য প্রোটিন এবং ম্যাঙ্গানীজ নুড়ি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকবে কারখানাগুলোতে। তাছাড়া ঐসব ভেলার শহরের অধিবাসীদের পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে প্ল্যান্ট বসানো হবে ঐ মাচার উপরেই। ওদের কাজ হবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাগরজল থেকে নুনগুলোকে বাদ দিয়ে তাকে পানযোগ্য করে তোলা। ব্যাপারটায় অবশ্য নতুনত্ব কিছুই নেই। ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু জাহাজে তো বটেই, এমনকি বহু দেশের উপকূল অঞ্চলের কারখানায় এমন সব সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে যার সাহায্যে সাগরের নোনা জলকে পাতন-ক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ করা হয়। সমুদ্রের নোনা জল থেকে নুনের ভাগটুকু ছেঁটে ফেলে বিশুদ্ধ জল পাওয়ার চেষ্টা অবশ্য চলছে বহুদিন ধরে। ১৯৬০ সালেই প্রথম একই সংগে এশিয়ার কুয়েত এবং ইয়োরোপের ব্রিটেনে এই উদ্দেশ্যে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি বসানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার খানেকের উপর জল শোধনের যন্ত্র এযাবৎ বসানো হয়েছে। ঐ সব যন্ত্রের এক একটি দিনে এক লক্ষ লিটারের মতো জল উৎপাদন করে। গুজরাটের সেন্ট্রাল মেরিন কেমিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুটের বিজ্ঞানীরাও পরীক্ষামূলকভাবে ঐধরনের কয়েকটা যন্ত্র বানিয়ে সমুদ্রের নোনা জল থেকে পানীয় জল তৈরি করছেন।

এইভাবে ডিস্‌টিল্‌ড্‌-ওয়াটার পেতে খরচটা বেশী পড়লেও পৃথিবীর শুখা দেশগুলোয় পানীয় জলের জন্য এ রাস্তাটাকেই বেছে নিতে হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা একধরনের প্লাস্টিকের পর্দা তৈরি করেছেন যার মধ্যে দিয়ে সাগরজল পাঠানোর সময় তা জলের মধ্যে মিশে থাকা রাসায়নিক নুনগুলিকে ছেঁকে নেয়। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে জলের উৎপাদনও শুরু হয়েছে ও দেশে। এতে খরচও পড়ছে কম—প্রতি হাজার লিটারে তিন টাকার মতো।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার মতো শুখা অঞ্চলগুলির পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে সবচেয়ে চমকদার পরিকল্পনাটা এসেছে জন আইস্যাক্‌স্‌-এর মাথায়। অতলান্তিক মহাসাগরের দক্ষিণে কুমেরুর যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধরে হিমশৈলগুলো ভাসছে—তাতে নুনের ভাগ নেই বললেই চলে। আইস্যাক্‌স্‌ আর তাঁর বিজ্ঞানী বন্ধুরা ঐসব লম্বা-চওড়া বরফের টুকরোগুলোকে সমুদ্রে ভাসিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে এনে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ওঁরা অংক কষে দেখিয়েছেন, ১৫ কিলোমিটার লম্বা, ১ কিলোমিটার চওড়া এবং প্রায় ২০০ মিটার পুরু একটা হিমশৈলকে বড়োসড়ো তিনটে জাহাজ-টানা জলযান দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে বয়ে যাওয়া 'হামবোল্ট' নামে মহাসাগরীয় স্রোতের মধ্যে এনে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত! ঐ স্রোতই

তখন হিমশৈলকে পেরু-ইকুয়াডর পার করে পেঁছে দেবে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে মেক্সিকোর কাছাকাছি। জাহাজ-টানা 'টাগ'-তিনটের এবার কাজ হবে—ঐ মহাসাগরীয় স্রোত থেকে পেল্লায় ঐ বরফের টুকরোটাকে বের করে এনে আমেরিকার লস্-এঞ্জেলেসের উপকূলে পেঁছে দেওয়া।

কুমেরু থেকে আমেরিকার উপকূলে পেল্লায় ঐ বরফের চাঙড়গুলিকে টেনে আনতে সময় লাগবে প্রায় ১ বছর এবং যাত্রাপথে যদি সে বরফের অর্ধেকও গলে জল হয়ে যায়—বাকী যেটুকু এসে পেঁছবে তা লস-এঞ্জেলেসের মতো প্রকাণ্ড শহরের যাবতীয় জলের চাহিদা মেটাবে একমাস ধরে। ঐ হিমশৈলকে টেনে আনার যে খরচ, তাতে দেখা যাচ্ছে লস্-এঞ্জেলেস্-এর নাগরিকদের প্রতি হাজার লিটার পরিশ্রুত জলের জন্য খরচ করতে হবে আমাদের হিসেবে এক পয়সারও কম! দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর মরু অঞ্চলে এভাবে হয়তো পানীয় জল যোগানোর বন্দোবস্ত হবে অদূর ভবিষ্যতে।

আগামী দিনে সমুদ্রের উপর মাচা বেঁধে তার উপর ভাসমান শহর বানানোর পরিকল্পনার কথায় আবার ফিরে আসি। এইসব শহরের জন্য কর্কট এবং মকরক্রান্তির মাঝখানের এলাকাকে বিশেষ করে বেছে নেওয়ার কারণ বিদ্যুতের সহজ-লভ্যতা; ওখানকার উপরের স্তরের জলের তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস, দিনে রাতে এবং ঋতুভেদে ঐ তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। আর হাজার মিটার গভীরে সেই জলের তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় ৫° সেলসিয়াসে। তাপমাত্রার এই পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক অভিনব পরিকল্পনা করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা।

জলের প্রায় হাজার মিটার গভীরে ঝুলিয়ে রাখা হবে বড়োসড়ো কয়েকটি আধার যাতে থাকবে ফ্রেয়ন নামে এক তরল রাসায়নিক। তরল ফ্রেয়ন ২২° সেলসিয়াসে উঠে এলেই তা বাষ্পীভূত হয়। সমুদ্রের উপর ২৫° সেলসিয়াসে বাষ্পের চাপ বাড়ে; টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাটা সেই বাষ্পের পক্ষে তখন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

শুধু তাই নয়, এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে টারবাইন চালানোর পর পাম্পের সাহায্যে ফ্রেয়ন বাষ্প আবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে হাজার মিটার গভীরে ডুবে থাকা আধারের ভেতর ৫° ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। ঐ ঠান্ডায় বাষ্প আবার তরলে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং একই ফ্রেয়ন বার বার কাজে লাগানো হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এভাবে বিদ্যুৎ তৈরির চেষ্টা প্রথম করেছিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী জর্জ ক্লদ। ১৯২৯ সালে কিউবার সমুদ্র উপকূলে এ সম্বন্ধে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে প্রথম সাফল্য আসে ১৯৭৯ সালে যখন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রজলের উষ্ণতার হেরফেরকে কাজে লাগিয়ে তরল অ্যামোনিয়াকে বাষ্পীভূত করে টারবাইন ঘোরানো হয়। এই পদ্ধতিতে প্রায় ৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিলো।

●

আগামী কয়েক দশকে সাগরের নিচে পড়ে থাকা খনিজের সুবিপুল ভান্ডার যে মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখনই পৃথিবীর ২০টার বেশী দেশ তাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানী তেলের একটা বড়ো অংশ তুলে আনছে মহাসাগরীয় সোপানের নিচে থেকে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। মাটির তলা থেকে তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস তুলে আনার জন্য ওখানকার অগভীর উপকূলে ১৫,০০০-এর বেশী নলকূপ বসানো হয়েছে। জ্বালানী তেল আর কয়লা ছাড়াও সাগরের নিচে পলিমাটি থেকে বিরাট পরিমাণ তামা এবং অ্যালুমিনিয়াম অদূর ভবিষ্যতে যেমন তুলে আনা সম্ভব হবে তেমনি গভীর সমুদ্রের নিচে ছড়িয়ে থাকা ম্যাঙ্গানীজ নুড়ি আমাদের নিকেল,

কোবাল্ট এবং আরো অনেক দুষ্প্রাপ্য ধাতুর চাহিদা মেটাবে। শুধু খনিজই নয়, সমুদ্রের নিচে পড়ে রয়েছে ফসফরাস সমৃদ্ধ খনিজের আকর। একদিন এগুলো তুলে এনে ডাঙ্গাজমির জন্য ফসফেট সার বানানোর সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। বাহামা'র এক কোম্পানী তো ইতিমধ্যেই সাগরের তলা থেকে চুনাপাথর তুলে এনে সিমেন্ট আর জমিতে দেওয়ার জন্য সার তৈরির কারখানা ফেঁদে বসেছে।

আগামী দিনে খাদ্যের বড়ো যোগানটা যে সমুদ্র থেকেই আসবে—সেটাই হলো বড়ো কথা। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী মানুষ আজ অনাহারে-অর্ধাহারে অপুষ্টিতে ভুগছে। অপুষ্টিটা মূলতঃ অ্যামিনো অ্যাসিডের ঘাটতির জন্যই।

এই অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি আবার জৈব প্রোটিন থেকে। ভবিষ্যতে মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী যে জৈব প্রোটিনের ঘাটতি দূর করবে—সে আশা আমাদের অনেকেরই।

সমুদ্রের জৈব সম্পদ,—বিশেষ করে সাগরের উঁচুতলার বাসিন্দাদের সংখ্যা বড়ানোর জন্য একসময় এক অভিনব পরিকল্পনা করেছিলেন কলম্বাস আইসেলিন। ওঁর ধারণা ছিলো, লম্বা লম্বা টিউবের সাহায্যে বাতাস পাম্প করে যদি জলের নিচে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে তা বুদবুদ আকারে উঠে আসার সময় সাগরের নিচের খনিজ সমৃদ্ধ জলকে উপরে ঠেলে নিয়ে আসবে।

আইসেলিনের এই পরিকল্পনাটাকে আংশিকভাবে কাজে লাগিয়ে ১৯৭০-এর দশকে দারুণ ফল পাওয়া গেছে। একদল সমুদ্রবিজ্ঞানী সাগরের নিচে থেকে জল তুলে এনে পুকুরে তা ছেড়ে দিয়ে দেখলেন—প্ল্যাংকটন জাতীয় জীবকণারা সেখানে বেড়ে উঠছে সমুদ্রের তুলনায় ২৭ গুণ বেশী হারে। ফলে সে পুকুরে যখন শামুক, কুচো চিংড়ী আর অন্যান্য মাছ ছাড়া হলো, তাদের বাড়বাড়ন্ত দেখে বিজ্ঞানীরা তো হতবাক।

আগামী দিনে সমুদ্র থেকে মাছধরার ব্যাপারেও বৈপ্লবিক সব কাণ্ডকারখানা হতে চলেছে। মাছের ঝাঁক জলের নিচে কোথায় চলে বেড়ায়—শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে তাতো এখনই জাহাজের উপর থেকে টের পাওয়া যায়; এই টের পাওয়াটাই আরো নিখুঁত হয়ে উঠবে আগামী দিনে। তাছাড়া রাসায়নিকের সাহায্যে মাছের ঝাঁককে আকৃষ্ট করে নির্দিষ্ট জায়গায় টেনে আনাটা সেদিন বোধহয় মোটেই অসম্ভব হবে না।

আগামী দিনের সমুদ্র সম্পর্কে এ সবই হলো ভালো ভালো সম্ভাবনার দিক; খারাপ সম্ভাবনাও কিন্তু আছে কিছু।
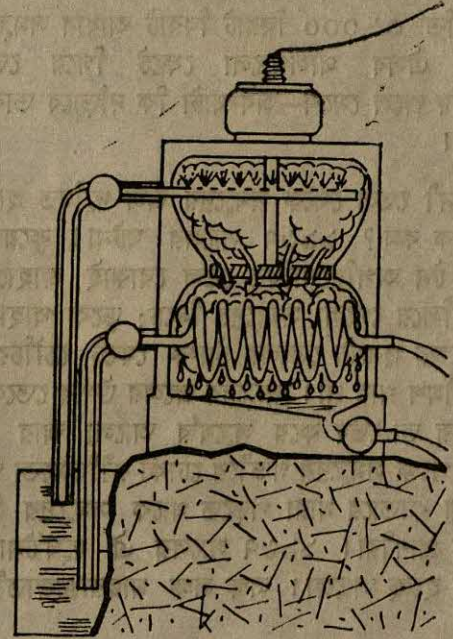
সাগরজলের উষ্ণতার হেরফেরকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদনের যান্ত্রিক মডেল। উপরের নল দিয়ে গরম জল এবং নিচের প্যাঁচানো নলের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা জল প্রবাহিত হচ্ছে।

যেমন, ১৯৫৪ সালে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলো। এর ফলে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরের জাপানী দ্বীপের জেলেরা তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয় এবং একজন মারা পড়ে। এছাড়া শিশুদের মধ্যে গলগণ্ড রোগ ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছিলো।

সমুদ্রে পরমাণু বিস্ফোরণ কাগজে কলমে বন্ধ থাকলেও, সাগরের নিচে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা জড়ো করার বিপদ সম্পর্কে কারোরই কোনও মাথাব্যথা নেই বললেই চলে। ১৯৬৮ সালে ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটা দেশ তেজস্ক্রিয়-আবর্জনা ভর্তি ৩৬,০০০ বিরাট বিরাট আধার সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলো। ঐসব থলিগুলো ফেটে গিয়ে তেজস্ক্রিয়-আবর্জনা যদি জলে মেশে—অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

জ্বালানী তেল থেকে সমুদ্রের জল দূষিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই কি কম? ১৯৬৭ সালের ঘটনা। কুয়েত থেকে ১,১৭,০০০ টন অপরিশোধিত তেল বোঝাই জাহাজে 'টরি ক্যানিয়ন' তলিয়ে গেলো সমুদ্রের নিচে; ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজের ছ-ছটা তেলের ট্যাঙ্ক ফেটে চৌচির হলো। তেলে জলে মিশ খায় না। সমুদ্রের জলের উপর তেলের পুরু আবরণ পড়ায় তা ভেদ করে সূর্যের আলো আর বাতাসের অক্সিজেনের পক্ষে সমুদ্রের গভীরে ঢোকা রীতিমতো অসম্ভব। ফলে কাতারে কাতারে মারা পড়তে থাকে সমুদ্রের নিরপরাধ উদ্ভিদ আর প্রাণীরা। ১৯৬৭ সালের ঐ দুর্ঘটনার ফলটা ভোগ করতে হচ্ছে আজো। লক্ষ লক্ষ মাছরাঙাজাতীয় পাখি মারা পড়েছে এযাবৎ। অন্যান্য সামুদ্রিক জীব যে কী হারে ধ্বংস হয়েছে,—তার লেখাজোখা নেই।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই কলকারখানার রাসায়নিক আবর্জনাগুলোকে নির্বিকারভাবে ফেলা হয় নদীতে অথবা সমুদ্রে। নদীও আবর্জনাগুলোকে শেষমেস সমুদ্রে এনেই ফেলে। এইসব আবর্জনা পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্রোপকূলকে হতশ্রী করে তুলছে এবং কিছু কিছু জায়গায় সমুদ্রের জল থেকে চর্মরোগ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তাছাড়া অন্য বিপদও আছে। ১৯৫০ সালে জাপানের কিউসু দ্বীপের মিনামাটা শহরের এক প্লাস্টিক কারখানা মিনামাটা উপসাগরে প্রচুর পরিমাণে আবর্জনা ফেলেছিলো—তার মধ্যে পারদেরও পরিমাণ ছিলো যথেষ্ট। ঐ অঞ্চলের জাপানী জেলেরা এ ব্যাপারটা না জেনে মিনামাটা উপসাগর থেকে যে মাছ ধরলো, তা খেয়ে বিষক্রিয়ায় মারা পড়লো শতাধিক মানুষ। পারদ-মেশানো আবর্জনা সাগরে ফেলার ফল ঐ অঞ্চলের মানুষকে ভুগতে হয়েছে এক দশকেরও বেশী সময় ধরে।

তাই বলছি, আগামী দিনের সমুদ্রেকে ঘিরে আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন এ সবই বুদ্বুদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে যদি না আমরা একটু সচেতন হই, দূষণের হাত থেকে সাগর-মহাসাগরকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসি। আমাদের সৌরজগতের একমাত্র প্রাণময় এই সবুজ গ্রহের সজীব অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্য এটাই আজ সবচেয়ে বেশি জরুরী।

ধরিত্রী তথা মহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে কত না চমকপ্রদ সব বিষয়বস্তু, যাদের অনেককে হয়তো চিনি কিন্তু জানি খুব সামান্যই। অনেককে হয়তো চিনিই না। অথচ আজ বিংশ-শতাব্দীর শেষপাদে বিজ্ঞানের অপরিসীম অগ্রগতির দৌলতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয় নিয়েই চলেছে নিরন্তর গবেষণা, উন্মোচিত হয়ে চলেছে নতুন নতুন বিস্ময়কর সব তথ্য, যা জানলে চমকে উঠতে হয়।

বিদেশী সাহিত্যে বিষয়ভিত্তিক এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশিত হয় যথেষ্ট। অথচ বাংলায় আজও তার একান্ত অভাব। এই অভাব সত্যিকার পরিপূরণের জন্যই আমরা 'অজানা নিখিলে' সিরিজটি প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি। বিশেষভাবে চেষ্টা করেছি এই সিরিজের বইগুলিকে খুব সহজ সরস গল্পের ভঙ্গিতে সববয়সের পাঠকের কাছে সমান আকর্ষণীয় করে তুলতে। আর তথ্যের নির্ভুলতা সম্বন্ধেও হয়েছি সবিশেষ যত্নবান।

পাঠক-পাঠিকাদের তৃপ্তি ও আনন্দই এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে আমাদের সবচেয়ে বড় পাথেয়।

বিষয়ভিত্তিক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া সিরিজ

প্রকাশিত ও সম্ভাব্য প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ

সাত সমুদ্র

আজব জীবের জীবন ধারা

মুছে যাওয়া দিনগুলি [ফসিল]

ভয়ংকরের জীবন-কথা

ইলেক্‌ট্রনিক্স—শুরু থেকে সম্প্রতি

ফুলে ভরা বসুন্ধরা

ঝড় জল রোদ্দুর [আবহাওয়া]

আকাশভরা সূর্য তারা

কত পাখি

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর

বিস্ময়কর মেরুদেশ

মরুভূমির কথা